দ্য মাস্টারমাইন্ড লিডার

সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী

আসলাম রাহী

দ্য মার্টায়ার লিডার

ফাহাদ আব্দুল্লাহ

অনূদিত

উৎসর্গ

উম্মাহর কল্যাণে ব্রতী প্রতিজন মর্দে মুমিনের প্রতি; আল্লাহ তাদের হৃদয়ে পূর্বসূরীদের সেই দহন-জ্বলন দিন। অন্যদের অনুকরণ ছেড়ে হাজার বছরের সোনাঝরা সফল শাসকদের অনুকরণে অনুপ্রাণিত করুন। এ-কামনা তাঁর মহান সত্তার প্রতি।

মুখবন্ধ

এক.

সময়টা তখন সালজুক সালতানাতের শাসক সুলতান মালিক শাহ সালজুকির শাসনামল। সালজুক বিন দাক্কাক রহ.-এর ছেলে তুঘরুল বেগ যে সালতানাতের প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর সুযোগ্য সন্তান সুলতান মালিক শাহ সালজুকির শাসনামলে এ সালতানাত তার স্বর্ণযুগে উপনীত হয়। আব্বাসী খেলাফত তখন প্রায় অস্তাচলে। বাগদাদেই সীমিত হয়ে এসেছে তার কর্তৃত্ব। কাগজে কলমে মুসলিমদের খলিফা আব্বাসীগণ হলেও বিশাল বিস্তৃত মুসলিম বিশ্ব শাসন করতেন সালজুক সুলতানগণ। তবে হাঁ, সালজুক সুলতানগণ আব্বাসী খলিফাদের প্রতি অনুগত ছিলেন। তাই খুতবায় খলিফার নামের সাথে সালজুক সুলতানের নামও সম্মানের সাথে উচ্চারিত হত।

দুই.

সুলতান মালিক শাহ সালজুকির সাথে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী রহ.-এর পিতা আবু সাঈদ আক সুনকুর রহ.-এর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। একই সাথে বেড়ে উঠেছেন উভয়ে। ছিলেন সুলতানের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

বহু যুদ্ধ তাঁরা লড়েছেন একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

সালতানাতের দায়িত্ব লাভের পর সুলতান মালিক শাহ তাকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয়—রাষ্ট্র পরিচালনায় সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতার পরামর্শ তিনি গুরুত্বের সাথে আমলে নিতেন। তাঁর মেধা ও দক্ষতা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে কাসীমউদ্দৌলা উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যার অর্থ- রাষ্ট্রের অংশীদার। তৎকালে কোন উপাধি ব্যক্তির যোগ্যতার পরিচায়ক হিসেবে বিবেচিত হত। আর এ উপাধি থেকেই বুঝা যায় কাসীমউদ্দৌলার প্রভাব কতোটা শক্তিশালী ছিল। দরবারে সুলতান মালিক শাহের পাশের আসনটি তাঁর জন্যই নির্ধারিত ছিল।

সর্বোপরি, তুর্কী বংশগুলোর মধ্যে কাসীমউদ্দৌলার বংশের আলাদা সম্মান তাকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত করে। পিতার এ অবস্থান ও খ্যাতিই সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর বড় হয়ে ওঠার পথকে সুগম করেছে।

সালজুকি সালতানাতের কেন্দ্র খোরাসান অঞ্চল থেকে শামের অবস্থান হাজার মাইলের দূরত্বে হওয়ায়, সেখানে প্রাচ্যের খ্রিষ্টানদের অভয়ারণ্য কায়েম হয়েছিল বলা চলে। সুলতান মালিক শাহ কাসিমউদ্দৌলাকে আলেপ্পোর শাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তিতে তিনি মসুলকেও নিজের শাসনে নিয়ে আসেন। আর তাঁর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে সালজুকদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়। তবে মালিক শাহের মহাপ্রয়াণের পর বিশাল এ সাম্রাজ্য ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে অস্তিত্ব

সংকটে পড়ে। মালিক শাহের ছেলে আর ভাইয়ের ত্রিমুখী অন্তঃঘাতের সুযোগে শাম ইরাকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি খ্রিষ্টানরা দখল করে নেয়। আর কাসিমউদ্দৌলাও এ ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ের শিকারে পরিণত হন।

তিন.

বাবার যোগ্য সন্তান হিসেবে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর আত্মপ্রকাশ ঘটে। তরুণ বয়সেই নিজের জাত চেনাতে সক্ষম হন তিনি। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বীরত্বে সবাই অভিভূত হয়। আমীর কারবুকার তত্ত্বাবধানে তিনি একজন দক্ষ ও বুদ্ধিমান সমরনায়কে পরিণত হন।

ক্রুসেডের যে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল বায়তুল মাকদিসকে কেন্দ্র করে, সে দাবানলের সামনে বুক টান করে দাঁড়ানোর হিম্মত যুবক ইমাদউদ্দীনই দেখিয়েছেন।

মসুলের আমীর বারসাকি আর ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী মিলে ক্রুসেডারদের বেশ কিছু দুর্গ দখল করতে সক্ষম হন। আমীর বারসাকির মৃত্যুর পর আবার স্ট্রাটিজিক্যালি গুরুত্বপূর্ণ মসুল শহর আমীরশূন্য হয়ে পড়ে। আর তখনই মসুলের গভর্নর হিসেবে জেঙ্গীর নিয়োগ ছিল টার্নিং পয়েন্ট। এক্ষেত্রে প্রখ্যাত আলেম বাহাউদ্দীন শাহরাযোরীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মসুলের শাসনভার লাভের পর থেকেই মূলত *জেঙ্গী রাজত্ব* বা *আতাবেকি রাজত্বের* সূচনা ঘটে। যা নুরউদ্দীন

জেঙ্গীর মাধ্যমে দাপটের সাথে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ক্রুসেডারদের প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

চার.

সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর সমরকৌশল ও রাষ্ট্রনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ঐতিহাসিকগণ। তিনি অত্যন্ত কৌশলী শাসক ও সমরনায়ক ছিলেন।

তাঁর মসুলের শাসনভার প্রাপ্তি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও নাজুক সময়ে। একদিকে ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা-স্বয়ং পোপ যার নেতৃত্ব দিত-আরেক দিকে শিয়া রাফেজীদের গোপন নীলনকশা-যার নেতৃত্বে ছিল মিসরের ফাতেমীরা। এ উভয়মুখী সংকট বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করা এবং প্রকৃত সত্য সুন্দর ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়কে বেগবান করা সহজ কোন বিষয় নয়। তবে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর মাঝে যেন আল্লাহ সব যোগ্যতার সমারোহ ঘটিয়ে ছিলেন।

শাসক হিসেবে যেমন ছিলেন একজন প্রজাদরদি বড়মনের মানুষ; তেমনি নিজের কর্মকর্তাদের বেলায় ছিলেন কঠোর।

রাজ্য চলে রাজার চালে। ইমাদউদ্দীন ছিলেন কূটনৈতিক চালেও অনন্য। শত্রুদের কিভাবে বিভক্ত করে রাখতে হয় তা তিনি বেশ জানতেন। তাঁর গোয়েন্দাবাহিনীর কথা ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে। শত্রু-মিত্র সবার হাঁড়ির খবরও পৌঁছে যেত

তাঁর কাছে দ্রুততার সাথে। ফলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিতে বেগ পেতে হত না তাকে।

তিনিই প্রথম কোন সালজুক সেনাপতি, যিনি বিক্ষিপ্ত ইসলামি শক্তিগুলোকে সুনির্দিষ্ট লক্ষে এককাতারে আনতে পেরেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, ক্রুসেডার এবং তাদের সেবাদাস রাফেজীদের মনোবলে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের কাছে শত্রুদের যাবতীয় চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ক্রুসেড-যুদ্ধে তিনি ছিলেন তাদের কাছে এক আতংকের নাম।

তাঁর শাসনামলের উল্লেখ করার মতো অনেক সাফল্যই তিনি অর্জন করেছেন। তবে *রুহা* বিজয় ছিল তাঁর সাফল্যের সোনার পালক। যদিও বহু দুর্গ ও শহর-মহল তিনি বিজয় করছেন– তবে *রুহা* দুর্গ বিজয়ের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। প্রাচ্যের খ্রিষ্টানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল এটি। এমন একসময়ে তিনি এ দুর্গ জয় করেন, যখন মুসলিম জনপদগুলোর আমীরগণ ক্ষমতার লড়াইয়ে জড়িয়ে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উম্মাহ হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যেন। অস্তিত্ব সংকটে ধুকছিল আব্বাসী খেলাফত। এমন সময়ে এ বিজয় যেন আসমানী রহমতস্বরূপ আবির্ভূত হয়। নবউদ্যমে জেগে ওঠে উম্মাহর তরুণ-যুবারা। হৃতভূমিগুলো পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন বুনতে থাকে তারা। ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী

স্বপ্ন দেখতেন, অন্যদের দেখাতেন এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে যা করার নির্ভয়ে করে যেতেন। উম্মাহর হৃদয়ে জিহাদের চেতনা শাণিত করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর শাসিত রাজ্যে জালিম ও জুলুমের অভিযোগ ছিল না। অসহায়ের আহাজারি শোনা যেত না। সার্বিকভাবে জনগণ সুখী ছিল। যোগ্যতার মূল্যায়ন করতেন। জ্ঞানচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আলেমদের পরামর্শ সানন্দে আমলে নিতেন। ব্যক্তিগতভাবে হানাফি মাজহাবের অনুসারী হলেও হকপন্থী সব মত ও পথের চিন্তা-দর্শন লালন ও পালনের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। তবে শিয়া রাফেজীদের ভ্রান্ত ও শিরকি মতবাদ যেন ছড়াতে না পারে, তার জন্য হকপন্থী আলেমদের দাওয়াতি ও ইসলাহি কার্যক্রম ছিল সদা সক্রিয়।

এক কথায়, ক্রুসেডার ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তিনি উল্লেখযোগ্য কর্মযজ্ঞ পরিচালিত করেছেন।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের যে ভিত তিনি রচনা করে গিয়েছেন; তার ওপরই মূলত পরবর্তীতে তাঁর সুযোগ্য সন্তান মহাবীর, ন্যায়ের প্রতিভূ সুলতান নুরউদ্দীন জেঙ্গী সৌধ নির্মাণ করতে পেরেছেন।

বর্তমান ইরাকের মসুলে যে রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হয়েছিল সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর হাতে; পরবর্তীতে নুরউদ্দীন জেঙ্গীর সময়ে তা ফুলে-ফেঁপে শাম, ফোরাত উপদ্বীপসহ

মিসরের বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলব্যাপী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী এ সালতানের ছত্রছায়ায় থেকেই বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের ছক আঁকেন।

তাই বলা যায়– নুরউদ্দীন জেঙ্গী ও সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সফলতার মূলে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর অবদান কোন অংশে কম নয়। রহিমাহুমুল্লাহু।

বই সম্পর্কে...

বক্ষমান পুস্তিকাটির লেখক উর্দুসাহিত্যের পরিচিত মুখ; ঐতিহাসিক আসলাম রাহী।

খুবই সংক্ষেপে তিনি তাঁর নিজস্ব স্টাইলে, ঝরঝরে গদ্যে সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী রহ.-এর জীবন ও কর্মের বিবরণ দিয়েছেন।

বইটির অনুবাদ করেছেন, তরুণ লেখক ফাহাদ আব্দুল্লাহ। আমরা চেষ্টা করেছি অনুবাদে মূলের স্বাদ ধরে রাখতে। সাথে সাথে পাঠকের সুবিধার্থে বইয়ে শিরোনাম ও প্রয়োজনীয় টীকা যুক্ত করা হয়েছে। মূল বইয়ে এ-দুটো কাজ ছিল না।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন

- সম্পাদক
হাসান মাহমুদ

সূচিপত্র

কে তিনি

জগৎজোড়া যার খ্যাতি। মহান ও ন্যায়পরায়ণ একজন সুলতান হিসেবে ইতিহাসের পাতায় প্রোজ্জ্বল যার নাম। ইনসাফ, প্রজাপ্রীতি এবং ন্যায়পরায়ণতায় তিনি ছাপিয়ে গিয়েছেন অনেককে। তিনি নিজে যেমন ধর্মীয় অনুশাসনে একনিষ্ঠ ও অত্যন্ত পাবন্দ ছিলেন, ধর্মীয় অনুশাসনের অনুসারী করার ক্ষেত্রেও ছিলেন খুব কঠোর– জনগণের উপর যেমন, নিজের গভর্নর, আমীর-উমারা ও অমাত্যবর্গের বেলায়ও ঠিক তেমনই।

কেউ তাঁর অধীন প্রজাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন এবং অযথা হয়রানি করবে, তা বরদাশত করতে পারতেন না কিছুতেই। তিনি সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সেনাফৌজের নেতৃত্বদানকারী অফিসারদের উপরও সদা তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাদের স্থাবর-অস্থাবর নিজস্ব কোন সম্পদ জমানোর এবং সঞ্চয় করার অনুমতি প্রদান করতেন না। সেনাবাহিনীকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, কোনো অবস্থাতেই যেন কেউ ক্ষেত-খামার এবং ফসলের ক্ষতি করতে না পারে। এবং সেনাবাহিনীর কেউ যেন কৃষকদের থেকে যথার্থ মূল্য পরিশোধ করা ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ না করে।

তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের দরোজা সমাজের সর্বস্তরের জনগণের জন্য ছিল উন্মুক্ত। এতে ধনী-গরিবের

কোনো ভেদাভেদ ছিল না। এমনকি ন্যায়বিচার প্রদানে তাঁর কাছে মুসলিম ও অমুসলিম জিম্মিদের মধ্যেও কোন প্রভেদ ছিল না। সবাই নিজ নিজ অধিকারে সমানে সমান ছিল। বিচারব্যবস্থায় আইন-কানুন এবং রীতি-নীতিও সেভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছিল।

একদিন জনৈক ইহুদি সুলতানের দরবারে এসে অভিযোগ করল, তাঁর একজন আস্থাভাজন প্রিয় সালার-সেনা অফিসার ইহুদির একটি বাড়ি জবরদখল করে নিয়েছে। তখন ঐ সালার সুলতানের কাছেই উপস্থিত ছিলেন। সালার অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব এবং সুলতানের প্রিয়ভাজন ও কাছের ছিলেন। কিন্তু যখন সুলতানের দরবারে ইহুদি ঐ সালারের নামে অভিযোগ দায়ের করল, তখন সুলতান সেই সালারের দিকে অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে তাকান; মনে হচ্ছিল যেন তাঁর চক্ষুযুগল থেকে অগ্নিবৃষ্টির বর্ষণ হচ্ছে। কথিত আছে, সুলতানের ভয়ে ভীত-কম্পিত হয়ে সেই সালার নীরবে স্থান ত্যাগ করে এবং ইহুদির যেই বাড়ি তিনি অন্যায়ভাবে দখল করেছিলেন তৎক্ষণাৎ তা ফিরিয়ে দেন। আর নিজের বাসস্থান হিসেবে যাযাবরের তাঁবুকেই গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি যেমনিভাবে বীর, ন্যায়পরায়ণ এবং ন্যায়বিচারক ছিলেন, তেমনি ব্যক্তিজীবনেও ছিলেন দানশীল ও দরাজদিল। বদান্যতা, দানশীলতা এবং দরিদ্র ও দুঃস্থদের দেখভাল-দেখাশোনা করাকে তিনি

নিজের সবচেয়ে বড় কর্তব্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। এই সাখাওয়াত ও বদান্যতার গুণ তাঁর মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, ঐতিহাসিকগণ তাকে *আবুস সাখাওয়াত* উপাধি দিয়েছিলেন।

তাঁর অভ্যেস ছিল, প্রত্যেক জুমআর নামাজের পূর্বে তিনি নিজহাতে একশ আশরাফি স্বর্ণমুদ্রা সদকা করতেন। আর অন্যান্য দিন নিজের আস্থাভাজন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ-কড়ি দুঃস্থ ও হতদরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করাতেন।

তাঁর খাবার দস্তরখানে উল্লেখযোগ্য পরিমান আলেম-উলামা, মুত্তাকি-পরহেজগার, কাজী-বিচারক ও দুঃস্থ-জনতা উপস্থিত থাকত। গরিব-দুঃখীদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। যেন কেউ ভুখা-নাঙ্গা না থাকে এদিকে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখতেন।

একবার শহরের বাইরে কোথাও পরিদর্শনে যাওয়ার পথে ঘোড়ার পা পিছলে যায়। অল্পের জন্য সুলতান পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পান। তখন তিনি এক সালারকে ডেকে তার কানে কানে কিছু বলেন। সালার তার ঘোড়া নিয়ে নিজের বাসস্থানের দিকে ছুটে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলে সুলতান জানতে চান, কী নিয়ে এসেছ? সে বলল—মুহতারাম সুলতান! কেবল এক হাজার দিনার পেলাম; তা-ই নিয়ে এসেছি। তখন সুলতান তার থেকে সেই এক

হাজার দিনার নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন।

মূল ঘটনা ছিল এই– সুলতানের ব্যক্তিগত কোন খাযানা ও ধন-সম্পদ ছিল না। যখন যা-ই পেতেন, দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। আর যখন কারো থেকে ঋণ নিয়ে সদকা করতেন তা দুই-তিন দিনের মধ্যেই পরিশোধ করে দিতেন।

কে ছিলেন এই মহান ব্যক্তি? কে ছিলেন এই ন্যায়পরায়ণ সুলতান? দরিদ্রদের প্রতি এই কোমল হৃদয়বান কে ছিলেন? আপাদমস্তক আল্লাহর ভয়ে কম্পিত কে এই সুলতান ?

তিনি আর কেউ নন, মুসলিম উম্মাহর আকাশের দীপ্তসিতারা, মহান ও সম্মানিত সুলতান ইমাদউদ্দীন রহ.।

পিতা কাসিমউদ্দৌলা

সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী রহ. মুসলিম বিশ্বের প্রবল প্রতাপশালী সুলতান মালিক শাহ সালজুকির আস্থা ও প্রিয়ভাজন সালার কাসিমউদ্দৌলার পুত্র ছিলেন।

তাঁর পিতা জাতিগতভাবে ছিলেন একজন তুর্কী। তাকে সুলতান মালিক শাহ সালজুকির প্রিয়ভাজন, মোসাহেব ও সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে গণ্য করা হত। সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতা কাসিমউদ্দৌলাকে সর্বপ্রথম

সুলতান মালিক শাহ সালজুকি রাজপ্রাসাদের হাকিম বানিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরই তাকে আলেপ্পোর শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেন। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির মতোই তিনি আলেপ্পো শহরের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। তাঁর এমন সুদক্ষ ও সুচারু পরিচালনা প্রত্যক্ষ করে সুলতান মালিক শাহ শুধু তাকে অভিবাদন জানিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং তাঁর ললাটেও চুম্বন করেন।

সুলতান মালিক শাহের মহাপ্রয়াণের পর শুরু হয় ইতিহাসের সেই পুরনো চরম ঘৃণ্য অধ্যায়ের। সুলতান মালিক শাহের দুই পুত্র বারকিয়ারোক এবং নাসিরউদ্দীন মাহমুদ ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। এদিকে সুলতান মালিক শাহের ভাই তাজউদ্দৌলাও ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা শুরু করে।

তাজুদ দাওলা তখন শাম অঞ্চলের হাকেম ও শাসনকর্তা ছিলেন। শাম থেকে বিশাল এক বাহিনীসহ রাজ্য দখলের অভিপ্রায়ে আলেপ্পো অভিমুখে যাত্রা করেন। তখন আলেপ্পোর শাসনকর্তা ছিলেন ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতা কাসিমউদ্দৌলা। সঙ্ঘর্ষে না জড়িয়ে তিনি তাজউদ্দৌলার বশ্যতা মেনে নেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন। কারণ তাজউদ্দৌলার বাহিনীর তুলনায় তাঁর বাহিনী ছিল নিতান্তই ছোট। তাই তাজউদ্দৌলাকে দমনের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি সৈন্যস্বল্পতার কারণে বশ্যতা

মেনে নেয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এদিকে তাজউদ্দৌলা বাহিনী নিয়ে তীব্রবেগে মালিক শাহের বড় ছেলে বারকিয়ারোকের অধীন অঞ্চলগুলোর দিকে অগ্রসর হন এবং আক্রমণ করে কিছু অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়ে তাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যদিকে সুলতান মালিক শাহের বড় ছেলে বারকিয়ারোক-যাকে কাসিমউদ্দৌলা কোলে-পিঠে করে বড় করেছেন–তিনিও চাচা তাজউদ্দৌলার মোকাবেলায় বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

তাজউদ্দৌলা নিজ বাহিনী নিয়ে একের পর এক অঞ্চল বিজয় করে [১]আজারবাইজানে উপনীত হলে বারকিয়ারোক তাজউদ্দৌলার বাহিনীর প্রতিরোধ করেন। উভয় দল রণপ্রস্তুতি নিয়ে মুখোমুখি হয়ে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দি হয়, তখন ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতা কাসিমউদ্দৌলা দেখলেন, তাঁর মুহসিন ও অনুগ্রহশীল মুরুব্বি মালিক শাহের বড় ছেলে বারকিয়ারোক ময়দানে অবতীর্ণ। তখন কাসিমউদ্দৌলা আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। আর কালবিলম্ব না করে তিনি তাজউদ্দৌলার পক্ষ ত্যাগ করে বারকিয়ারোকের সঙ্গে মিলিত হন। কাসিমউদ্দৌলা নিজ বাহিনী নিয়ে পক্ষ ত্যাগ করার কারণে তাজউদ্দৌলার রণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সে সেনাস্বল্পতা অনুভব করতে

---

১. আজারবাইজানের ভৌগোলিক অবস্থান হল– এর পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর,উত্তরে রাশিয়া, পশ্চিমে আর্মেনিয়া আর দক্ষিনে ইরান।

পেরে যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ করে বাহিনী নিয়ে দামেশকে ফিরে যায়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ইমাদউদ্দীনের পিতা কাসিমউদ্দৌলা, তাজউদ্দৌলার পক্ষ ত্যাগ করে তার ভাতিজা বারকিয়ারোকের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তাজউদ্দৌলা প্রচণ্ড চটে গিয়েছিল। রাগে-ক্ষোভে গজগজ করতে থাকে। এ অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাই সে দামেশকে পৌঁছেই জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে। যুদ্ধপ্রস্তুতি পূর্ণ করে বিশাল সৈন্যবহর নিয়ে তাজউদ্দৌলা প্রতিশোধের জন্য কাসিমউদ্দৌলার নিয়ন্ত্রিত শহর দামেশক অভিমুখে যাত্রা করে।

এদিকে তাজউদ্দৌলার সমরাভিযানের সংবাদ পৌঁছে যায় দামেশকে। কালবিলম্ব না করে সুলতান বারকিয়ারোক কাসিমউদ্দৌলার সাহায্যার্থে তাঁর বড় বড় তিনজন সালারকে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দেন। সুলতান বারকিয়ারোকের পক্ষ থেকে কাসিমউদ্দৌলার সাহায্যার্থে যে সালারত্রয় এসেছিলেন, তাদের একজনের নাম ছিল আমীর কারবুকা, তার ভাই আততূন-তাশ আর তৃতীয়জনের নাম আমীর বাযান।

অবশেষে তাজউদ্দৌলা এবং ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতা কাসিমউদ্দৌলার বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। কাসিমউদ্দৌলার বাহিনী ছিল নিতান্তই ছোট। বিপরীতে তাজউদ্দৌলার বাহিনী ছিল অনেক বড়। তাই সেনাস্বল্পতার কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর কাসিমউদ্দৌলার

বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। তাজউদ্দৌলা বিজয় ছিনিয়ে নেয়। এ-যুদ্ধে কাসিমউদ্দৌলার সাথে সালারত্রয় কারবুকা, আততূন তাশ ও বাযানও বন্দি হন।

যখন কাসিমউদ্দৌলাকে তাজউদ্দৌলার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় তখন তাজউদ্দৌলা তাকে জিজ্ঞাসা করে–

কাসিম! আজ যদি তুমি আমার উপর বিজয়ী হতে, তাহলে আমার সাথে কেমন আচরণ করতে?

কাসিমউদ্দৌলা কাপুরুষ ছিলেন না, তাই তৎক্ষণাৎ বুক চিতিয়ে বজ্র আওয়াজে বললেন, আমি তোমাকে হত্যার পরওয়ানা জারি করতাম। এতে ফিতনা-ফাসাদের শিকড় উপড়ে যেত এবং বিশৃঙ্খলার দরোজা বন্ধ হত।

প্রতিউত্তরে তাজউদ্দৌলা বলে, আমিও এখন তোমার জন্য এই পরওয়ানাই জারি করছি। তারপর ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতা কাসিমউদ্দৌলার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।

কাসিমউদ্দৌলার মর্মান্তিক শাহাদাতের সময় তাঁর পুত্র ইমাদউদ্দীন ১২/১৪ বছরের শিশু। ইমাদউদ্দীন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। রণাঙ্গণে তিনিও পিতার সঙ্গেই ছিলেন। পিতার পরাজয় ও মর্মান্তিক শাহাদাতবরণ প্রত্যক্ষ করে, গোপনে রণাঙ্গণ থেকে সটকে পড়েন এবং দামেশক থেকে পালিয়ে সুলতান বারকিয়ারোকের

দরবারে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের কাজ করেন। বারকিয়ারোক বালক ইমাদউদ্দীনের ওপর স্নেহপরবশ হয়ে তাকে নিজের বাহিনীতে শামিল করে নেন।

এরপর সুলতান বারকিয়ারোক এবং তাঁর চাচা দামেশকের শাসনকর্তা তাজউদ্দৌলার মাঝে একাধিক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমদিকে তাজউদ্দৌলার পাল্লা ভারি থাকলেও, [২]*রায়* শহরের উপকণ্ঠে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তাজউদ্দৌলা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং তাজউদ্দৌলা নিজেও বন্দি হয়।

বন্দি হওয়ার পরই ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতা কাসিমউদ্দৌলার একান্ত অনুগত এক সৈনিক কাসিমউদ্দৌলার মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসেবে সেখানেই তাজউদ্দৌলার গর্দান উড়িয়ে দেয়। সুলতান বারকিয়ারোক এবং তাজউদ্দৌলার মধ্যে যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার সবগুলোতেই ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সুলতান বারকিয়ারোকের সাথেই ছিলেন। তাজউদ্দৌলার হত্যার মধ্য দিয়েই সমাপ্ত হয় এ রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের।

তাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর শামের শাসনকর্তার আসনে সমাসীন হন তারই সুপুত্র রিদওয়ান। আপাদমস্তক একজন

---

২. রায় একটি ঐতিহাসিক শহর। ইরানের রাজধানী তেহরানের দক্ষিন-পূর্বে এর অবস্থান। উমর রাযি.-এর সময়ে এটি বিজয় করেন মুসলমানগণ। বাদশাহ হারুন উর রশীদ, আবু বকর রাযী., ফখর উদ্দীন রাযীর জন্মভূমি এই রায় শহর।

সৎ ও হৃদয়বান মানুষ ছিলেন তিনি। শাসনভার গ্রহন করেই তিনি সুলতান বারকিয়ারোকের আনুগত্য প্রকাশ করেন। সুলতানও যে সকল অঞ্চল যুদ্ধের মাধ্যমে তার পিতার কাছ থেকে হস্তগত করেছিলেন তা সাদরে ফিরিয়ে দেন। সাথে তার সন্তুষ্টির জন্য দামেশকের শাসনভারও তাকে অর্পণ করেন।

এরপর সুলতান বারকিয়ারোক রিদওয়ানকে নির্দেশ দেন, তার পিতা যে সালাত্রয়কে বন্দি করেছিল তাদের মুক্ত করে দিতে। সুলতানের নির্দেশ পেয়ে রিদওয়ান তাদের মুক্ত করে দেন। জিন্দানখানা থেকে মুক্ত হয়েই সালার কারবুকা এক বিরাট সফলতা অর্জন করেন। কারবুকা ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতা কাসিমউদ্দৌলার প্রিয় বন্ধু ছিলেন। মুক্তি পেয়েই তিনি একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। এরপর [৩]*হাররান* এবং মসুলে উপর্যপুরি আক্রমণ করে তা দখল করে নেন।

তার এই কীর্তিমান কাজে সুলতান বারকিয়ারোক খুশি হয়ে তাকে মসুলের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

---

৩. হাররান অতি প্রাচীন একটি শহর। এর অবস্থান তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বে বালীখ নদীর মোহনায় । ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানরা এ শহর বিজয় করেন। এটি একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এটি সিরিয়ার অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে লুজান চুক্তি অনুযায়ী এটি তুরস্কের অন্তর্ভূক্ত হয়। [উইকিপিডিয়া]

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর বেড়ে ওঠার পেছনে আমীর কারবুকার ভূমিকা

যেহেতু কারবুকা ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পিতার পুরনো বন্ধু ছিলেন, তাই তিনি সুলতান বারকিয়ারোকের কাছে বন্ধু কাসিমউদ্দৌলার পুত্র ইমাদউদ্দীনকে তাঁর দায়িত্বে দেয়ার আবেদন করেন। যাতে তিনি ইমাদউদ্দীনের উত্তম তারবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন। সুলতান কাসিমউদ্দৌলার প্রিয় বন্ধু কারবুকার ইচ্ছা ও আকাঙ্খার প্রতি সম্মান দেখিয়ে ইমাদউদ্দীনকে আমীর কারবুকার কাছে সোপর্দ করেন। কারবুকা ইমাদউদ্দীনের শিক্ষা-দীক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করেন এবং ইমাদউদ্দীনের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য তাঁর নামে জায়গিরের ব্যবস্থা করেন।

এভাবেই কারবুকা ইমাদউদ্দীনের পিতার সাথে তার বন্ধুত্বের দাবি পুরোপুরিভাবে আদায় করেন। আমীর কারবুকা সেই সৌভাগ্যবান মহান ব্যক্তি, যার যোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা ও সচেতন তত্ত্বাবধানের ফলে ইমাদউদ্দীন তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কীর্তিমানব হয়ে ওঠার পেছনে আমীর কারবুকার অবদান অনস্বীকার্য।

আমীর কারবুকার দেয়া তারবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর মাঝে স্বমহিমায় প্রতিফলিত হতে বেশি সময় লাগেনি।

একবারের ঘটনা। আমীর কারবুকা তাঁর বাহিনীসহ [৪]*আমিল* শহরে আক্রমণ করেন। তখন তিনি ইমাদউদ্দীনকে বাহিনীর এক ইউনিটের সালার নিযুক্ত করেন। এটিই ছিল ইমাদউদ্দীনের প্রথম কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ। ইমাদউদ্দীন এ যুদ্ধে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন যে, শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। শত্রু-মিত্র সবার মুখে তাঁর প্রশংসা উচ্চারিত হয়।

বলা হয়, এ যুদ্ধে আমীর কারবুকা এবং ইমাদউদ্দীনের যৌথ আক্রমণে শত্রুবাহিনী ন্যাক্কারজনক পরাজয়ের শিকার হয়। আমীর কারবুকা শত্রুবাহিনীর পিছনে ধাওয়া করতে করতে একসময় বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শত্রুবাহিনীর পলায়নরত সেনাদের ঘেরাওয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ঘটনার আকস্মিকতায় কারবুকা নিজের চোখের সামনে যেন মৃত্যুর ছায়া দেখতে পান। ঠিক তখনই বিদ্যুৎগতিতে নিজের সেনা-ইউনিটসহ সেখানে উপস্থিত হন ইমাদউদ্দীন। এবং কচুকাটার মতোই শত্রুদের মেরেকেটে উদ্ধার করেন আমীর কারবুকাকে।

এ হামলার পর ইমাদউদ্দীন ও তাঁর বাহিনীর সাহস ও উদ্দীপনায় যেন জোয়ার আসে। তারা বীরবিক্রমে *আমিল* শহরে হামলা করে নগরপ্রাচীরের একাংশ ধ্বসিয়ে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যুহ তছনছ করে দূর্গের চূড়ায় বিজয়-কেতন উড্ডীন করেন।

---

৪. ইরাকের মসুল শহরের অন্তর্গত একটি ছোট শহর।

এই ঘটনার পর সুলতান বারকিয়ারোক এবং আমীর কারবুকার কাছে ইমাদউদ্দীনের অবস্থান ও মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

নিয়তির অদৃশ্য খেলা! আমীর কারবুকা এর কিছুদিন পরই মহান প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে নশ্বর দুনিয়া থেকে চির বিদায় নেন।

আমীর কারবুকার ইন্তেকালের পর মসুলের গভর্নর নিযুক্ত হন মূসা তুর্কমানি। কিন্তু তিনিও কয়েক মাসের মাথায় ভবসংসার থেকে চির বিদায় নিয়ে যান। আমীর মূসার মৃত্যুর পর সালার যারকামিশ মসুলের উপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

নতুন আমীর যারকামিশ আগে থেকেই ইমাদউদ্দীনকে স্নেহবাৎসল্যে নিজের পুত্রতুল্য মনে করতেন। খুব ভালোবাসতেন। যারকামিশ মসুলের আমীর হয়েই আপন পুত্র গিয়াসউদ্দীনের কন্যার সাথে ইমাদউদ্দীনের বিয়ে দেন। এবং ইমাদউদ্দীনের নামে কিছু এলাকার জায়গিরদারি বরাদ্দ করেন। কিন্তু কিসমতের গর্দিশ! এই আনন্দের মধ্যেই দুঃসংবাদ হয়ে আসে সুলতান বারকিয়ারোকের ইন্তেকাল। যিনি ইমাদউদ্দীনের প্রতি সবচেয়ে সুহৃদ ও অনুরাগী ছিলেন। সুলতানের ইন্তেকালের পর গিয়াসউদ্দীন বিন মালিক শাহ ইরাক ও ইরান সাম্রাজ্যের অধিকর্তা হন।

মসুলের অবস্থা তখন অত্যন্ত নাজুক। রাজনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তাই ইমাদউদ্দীন হিজরত করে অন্যত্র চলে যান। তবে ইমাদউদ্দীনের ভাগ্য সুপ্রসন্নই বলতে হয়। দ্রুতই মসুলের অবস্থার উন্নতি হয়। পরিস্থিতি শান্ত হয়। মসুলের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন আমীর মওদুদ। যিনি ইমাদউদ্দীনকে ভালোবাসতেন এবং তাঁর মূল্যায়ন করতেন। ইমাদউদ্দীন তাই আর কালবিলম্ব না করে মসুলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমীর মওদুদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন।

তারপর আমীর মওদুদ এবং ইমাদউদ্দীন সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজান।

বিপদের ঘনঘটা

সময়টা ছিল মুসলমানদের অধঃপতনের। পরিস্থিতি ছিল মুসলমানদের প্রতিকূলে। একদিকে ইরাক-ইরান, ফিলিস্তিন এবং শামের শাসকদের অনৈক্য ও ক্ষমতার লড়াই ছিল চরমে। সুযোগ পেলে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দুবার ভাবতো না। শতধা বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত হয়ে পড়েছিল উম্মাহ। আর এ সুযোগে ক্রুশের পূজারীরা ইউরোপ থেকে উড়ে এসে জেঁকে বসে মুসলিম সাম্রাজ্য ও ভূ-খণ্ডগুলোতে। ছিনিয়ে নেয় মুসলমানদের বে-শুমার শহর এবং অগণিত অঞ্চল।

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী যখন কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। দিশেহারা উম্মাহ নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়েছিল!

ক্রুসেডারদের পৈশাচিকতার সামনে ইরাক, শাম ও ফিলিস্তিনের মুসলমানরা ছিল অসহায়। বিপর্যস্ত। মুসলমানদের না ছিল ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা; না জানের নিরাপত্তা। কারণ বিগত কবছরে সালতানাতের বিশাল এলাকা ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। এডেসা, এন্তাকিয়া, বাইতুল মাকদিস, বৈরুত, ত্রিপলী, আক্কা, সাদসিদা, আরসুফ, কায়সারিয়া, মার্ম, তাবরিয়া ও বানিয়াতের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ও নগরীতে ক্রুসেডাররা জেঁকে বসে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

এসকল অঞ্চলে ক্রুসেডাররা মূলত *টেম্পলার* আর [৫]*হসপিটালার* এ দুই উগ্রপন্থী ধর্মীয় সশস্ত্র গ্রুপের সহায়তায় আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।

টেম্পলার নাইটরা যেহেতু সেন্ট জনের টেম্পলে (গির্জা ও আশ্রমে) খ্রিষ্টধর্মের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিত, তাই তাদের এই নামে ডাকা হয়। আর হসপিটালার নাইট বলা হত, যারা চিকিৎসা ও সেবাকেন্দ্রগুলোতে রুগ্নদের সেবায় নিয়োজিত ছিল। তবে

---

৫. একটি ক্যাথলিক মিলিটারি সংঘ। আল-কুদসে আসা খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের সেবার জন্য ১০২৩ খ্রিষ্টাব্দে জেরার্ড থম এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

সামরিকবাহিনী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া সত্ত্বেও চরম ধর্মীয় উত্তেজনায় এরা নিজেদের নিয়মতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর অংশে পরিণত করে। কারণ তারা মুসলমানদের জানি শত্রু ছিল। তাদের অস্থি-মজ্জায় মুসলিম বিদ্বেষ ও ইসলাম বিরোধী মনোভাব মিশে গিয়েছিল। মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার সামান্যতম সুযোগও তারা হাতছাড়া করত না। তাদের হিংস্রতা আর বর্বরতায় মুসলমানদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ঐতিহাসিকরা তো এ-ও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এই দুই শ্রেণীর ইসলাম বিদ্বেষী ও মানবতা-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের হিংস্রতা দেখে খোদ শয়তানও এদের কাছ থেকে আশ্রয় চাইত।

খ্রিষ্টান-অধিকৃত এসকল অঞ্চল ও নগরীগুলোতে মুসলমানরা চতুর্মুখী বিপদে আচ্ছন্ন ছিল। চারদিকে কেবল হতাশা আর হতাশা। আঁধারের কৃষ্ণতা ফিকে করে যে একসময় নয়া প্রভাতের আগমন ঘটে, সেই স্বপ্ন দেখাও যেন এই মুসলমানরা ভুলে গিয়েছিল। নিরাশা তাদের এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছিল যে, কল্যাণের আশাও ছিল অকল্পনীয়।

সর্বত্র খ্রিষ্টানদের জুলুম-নির্যাতনে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল। তবে, এতো পতন-অধঃপতনের পরও মুসলমানরা সচেতন হতে পারেনি। অগণিত অঞ্চল

ও অসংখ্য শহর হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও জাতির কর্ণধাররা সুখনিদ্রা থেকে জেগে উঠেনি; বরং গাফলতের চাদর মুড়ি দিয়ে সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে যাচ্ছিল। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটে নিপতিত হয়েও কর্ণধাররা তা থেকে উত্তরণের কোন পথ ও পন্থা বের করার চেষ্টা করেনি। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়নি বা হতে পারেনি। একে অপরের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে ঐক্যের প্লাটফর্মে আসতে পারেনি।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা আত্মভোলা সম্প্রদায় থেকে নিজের রহমতের দৃষ্টি উঠিয়ে নেন। নিজের সাহায্যের দ্বার বন্ধ করে দেন। মুসলমানদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তখন কিছুটা যেন এমনই মনে হবে যে, এই জাতি থেকে সত্যিই বরকত ও রহমত উঠে গেছে। আসলে আল্লাহ তাআলা মানবজাতির জন্য কিছু রীতিনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে জাতি সেই রীতি পালনে সচেষ্ট হবে এবং সেই নীতি আঁকড়ে ধরবে; সেই জাতির উন্নতিও তত দ্রুত হবে। তারা উন্নতির শীর্ষ শিখর স্পর্শ করবে। আর যে জাতি এই রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে বেপরোয়া হয়ে চলবে, তাদের জন্য পতন অনিবার্য। কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়াই তাদের নিয়তি।

অনস্বীকার্য বাস্তবতা হচ্ছে, যে জাতিই উন্নতি ও উৎকর্ষতা লাভ করতে চায়, কালের মহাদুর্যোগের সঙ্গে টক্কর দিয়ে স্থায়িত্ব পেতে চায়—তাদের জন্য ঐক্য, নিঃস্বার্থ

মনোভাব, পরিশ্রম, পরার্থপরতা এবং নিবেদিতপ্রাণ হওয়া আবশ্যক। আর যে জাতি এই আবশ্যক বিষয়গুলো অর্জনের প্রচেষ্টায়ও ব্রত হবে না; বরং স্বজাতির কল্যাণকামনার স্থলে বিদ্বেষ পুষবে, ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্যের পথকে বেছে নিবে–তো সে জাতির ওপর রাজাধিরাজ মহানপ্রভু লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা ছাড়া কি-ই বা চাপিয়ে দিতে পারেন?

কালাবর্তে এখানে এসেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। খেলাফতে রাশেদার বরকতময় যুগের পরিসমাপ্তির পর ইসলামি সাম্রাজ্যের শাসনভার উমাইয়াদের ভাগ্যে আসে। উমাইয়াদের সময়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন ও নানান সমস্যা সত্ত্বেও–খেলাফতের কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত ছিল। ধর্ম, রাজনৈতিক ও বংশগত সৌহার্দ্যের কারণে মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্য অটুট ছিল। পরস্পরিক সহায়তা ও বোঝাপড়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে মুসলিম উম্মাহ শত সমস্যায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও মুজাহিদরা যেদিকেই অগ্রসর হয়েছেন বিজয় তাদের পদচুম্বন করেছে। ঐক্য ও পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্যের কারণেই তখন ইসলামের বিজয় অপ্রতিরোধ্য গতিতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিল। ন্যায় ও সাম্যের মহান ধর্ম ইসলামের পতাকা সমুন্নত ছিল।

একসময় কালের পালাবর্তনে উমাইয়া-শাসনের পতন ঘটে। ইসলামি সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে আব্বাসীয়রা। তাদের শাসনকালের মূল স্পিরিটও

প্রায় একশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। আব্বাসীয়দের মধ্যে প্রতাপশালী শাসক হিসেবে দুজনকে বিশেষভাবে ধরা যায়–সুলতান হারুনুর রশিদ ও মামুনুর রশিদ। তাদের শাসনামল ছিল আব্বাসী খেলাফতের যৌবনকাল।

আব্বাসীয়দের ভুল ছিল–তারা আরবদের বিরুদ্ধে অনারবদের উস্কে দিয়েছিল। উমাইয়াদের পতনকে ত্বরান্বিত করতে তারা অনারবদের কৌশলে ব্যবহার করেছিল। আর এভাবেই উম্মাহর শিরা-উপশিরায় আরব-অনারব বিভক্তি এবং বংশীয় বিভাজনের বিষাক্ত বিষ প্রবেশ করে।

কিন্তু ইতিহাস নীরব সাক্ষী! এর ফল একেবারেই ভালো হয়নি। কারণ সময় যতই গড়াচ্ছিল, আরব-অনারব বিভক্তি বেড়েই চলছিলো। পরিণামে দেখা গেল, আব্বাসীয়রা একসময় নিজেরাই সেই বিভক্তি ও বিভাজনের শিকার হলো।

পরবর্তী ইতিহাস খুবই করুণ! খেলাফতের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গুর হয়ে যায়। যার ফলে মুসলমানদের ঐক্যে চিড় ধরে। কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকা রাজ্যগুলো শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যেকেই নিজের অধীনে থাকা অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা দিয়ে দেয়। ঐক্যের পরীবর্তে বিদ্বেষকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। আর এভাবেই উম্মাহর পতনের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

পরস্পরের এই বিদ্বেষ ও অনৈক্যকে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে ইউরোপের খ্রিষ্টানরা। বাঁধ ভাঙা জোয়ারের মত আছড়ে পড়ে আরবজাহানের ওপর। একে একে শাম, ইরাক ও ফিলিস্তিনের বহু অঞ্চল তারা দখল করে নেয়।

ইমাদউদ্দীন নিজের চারপাশের পৃথিবীকে বুঝতে শুরু করেছেন মাত্র। মুসিলমজাহানের ওপর ক্রুসেডারদের এমন নগ্ন পদচারণা দেখে ইমাদউদ্দীনের ভেতরে প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলেন। মুসলিম উম্মাহর হারানো ভূমিগুলো পুনরুদ্ধারে কী পদক্ষেপ নেয়া যায় এ চিন্তায় তাঁর সময় কাটে।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে শুরু হল এক দীর্ঘ লড়াই

আমীর মওদুদ ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীকে তাঁর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার পর উভয়ে মিলে সেনাবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম ও শক্তি বাড়াতে থাকেন। বাহিনীতে যাতে সেনাঘাটতি দেখা না দেয়। তাই বাহিনীর পরিধি বৃদ্ধি করার প্রতি মনোযোগ দেন। আমীর মওদুদ অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ও সাহসী ছিলেন। ইউরোপীয় এবং স্থানীয় খ্রিষ্টানরা মিলে যে অঞ্চল ও নগরীগুলো মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল, তা পুনরুদ্ধারের কথা আমীর মওদুদের আগে কেউ চিন্তাও করেনি।

আমীর মওদুদই প্রথম ব্যক্তি, যিনি নিজেদের হৃত অঞ্চল ও হারানো নগরীগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য ইউরোপের ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যথারীতি যুদ্ধ-জিহাদ সূচনা করার দৃঢ় সংকল্প করেন।

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী যখন আমীর মওদুদের সংকল্পের কথা শুনতে পেলেন, তখন তাঁর খুশির আর সীমা রইল না। কারণ তিনিও অনেকদিন যাবত মুসলনানদের এই নাজুক অবস্থার জন্য খুব চিন্তিত ছিলেন। মনে মনে প্রবলভাবে কামনা করতেন যে, ক্রুসেডারদের শায়েস্তা করার এবং তাদের কবল থেকে উম্মাহর প্রতিজন শহীদের রক্তের বদলা নেয়ার একটা সুযোগ যদি আসত!

আমীর মওদুদ এবং ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী মুসলমানদের ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার কাজে মনোনিবেশ করলেন। সর্বপ্রথম তারা [৬]*সিজিস্তানে*র দিকে রোখ করেন। তাদের উপর মৃত্যুদূত হয়ে অবতীর্ণ হন। ক্রুসেডাররদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করে পুনরুদ্ধার করেন *সিজিস্তান*।

এ-যুদ্ধে ইমাদউদ্দীন শত্রুবাহিনীর ঘেরাওয়ে পড়েন। তবে তিনি শঙ্কিত না হয়ে নির্ভীকচিত্তে সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যান। শত্রুবাহিনীর ওপর বজ্রাঘাত হেনে অগণিত

---

৬. সিজিস্তান একটি ঐতিহাসিক শহর। খেলাফতে ইসলামিয়ার সময় স্ট্রাটিজিক্যালি এর অনেক গুরুত্ব ছিল। প্রাচ্যের রক্ষাকবচ হিসেবে এটি বিবেচিত হত। বর্তমান আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তানের কিছু অঞ্চল ব্যাপি বিস্তৃত ছিল এই শহরটি। [উইকিপিডিয়া]

ক্রুসেডারদের নিধন করে ঘেরাও ভেঙ্গে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। সিজিস্তানের ক্রুসেডারদের পরাজিত হওয়ার মধ্য দিয়েই মূলত উম্মাহর আকাশে ঘনায়মান কালো মেঘ দূরীভূত হতে থাকে।

সিজিস্তান উদ্ধারের পরপরই আমীর মওদুদ এবং ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী কালবিলম্ব না করে *এডেসা* শহর পুনরুদ্ধারে সেনাদল নিয়ে সেদিকে ছুটে যান। এই ময়দানেও ক্রুসেডাররা চরমভাবে পরাজিত হয়।

এডেসা পুনরুদ্ধারের পর ইসলামের এই দুই সিপাহসালার স্বস্তির নিঃশ্বাস নেননি। ছুটে যান [৭]*তাইবেরিয়াস* শহরে ঝড়ের গতিতে। এটি ছিল এক রক্তক্ষয়ী ও ভয়ানক যুদ্ধ। ইমাদউদ্দীন অভাবনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রদর্শন করেন এ যুদ্ধে। শত্রুবাহিনীর প্রতিরোধব্যূহ গুড়িয়ে তাদের কচুকাটা করতে করতে নগরপ্রাচীরের পাদদেশে গিয়ে পৌঁছেন তিনি। প্রচণ্ড আবেগ ও জোশে নিজের বর্শাটি সবেগে শহরের মূল ফটকে গেঁথে দেন।

এরপর দ্রুতই ইমাদউদ্দীনের শৌর্য-বীর্য ও সাহসিকতার প্রসিদ্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সফলতা তাঁর হস্তচুম্বন করতে থাকে। তাঁর নাম শুনে ক্রুসেডারদের মনে কাঁপন ধরতো।

---

৭. তাইবেরিয়াস অধিকৃত ফিলিস্তিনের একটি প্রচিন শহর। আল-কুদস থেকে আনুমানিক ১৯৮ কি.মি. উত্তর-পূর্বে এর অবস্থান। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জায়ানবাদীরা এটি দখল করে নেয়। [উইকিপিডিয়া]

ভাগ্য আর পরিস্থিতি সবসময় কাউকে সঙ্গ দেয় না। এখানেও হলো তাই!

আমীর মওদুদ যিনি ক্রুসেডবিরোধী কয়েকটি ময়দানের সফল অধিনায়ক, তিনি দামেশকের জামে মসজিদে নামাজরত অবস্থায় হাসান বিন সাবাহের এক হাশিশি আততায়ীর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম জাহানের জন্য এ ছিল এক চরম দুঃসংবাদ! কারণ এই আমীর মওদুদই সেই মহান ব্যক্তি, যিনি ইউরোপ থেকে ধেয়ে আসা ক্রুসেডারদের বাঁধ ভাঙা জোয়ারকে রুখে দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন এবং তাদের চরমভাবে পরাজিতও করেছিলেন।

আরো একবার ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হয়ে যায়। কারণ আমীর মওদুদ, যিনি তাকে পুত্রতুল্য আদর-স্নেহ করতেন–তাঁর শাহাদতের ফলে ইমাদউদ্দীন অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়েন।

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

ইমাদউদ্দীন ও অন্যান্য কিছু শাসকরা আর সুলতান মাহমুদই এখন মুসলমানদের আশার প্রতীক।

সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে কিছু কথা বলে নিই।

ইতিহাসের মহানায়ক, বিখ্যাত শাসক সুলতান মালিক শাহ সালজুকির সন্তান ছিল পাঁচজন। আহমদ,

বারকিয়ারোক, মুহাম্মদ, সানজার এবং মাহমুদ। সুলতান মালিক শাহের বড়ছেলে আহমদ তাঁর জীবদ্দশায়ই এগারো বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তারপর ইতিহাসের মহান ব্যক্তি উজির নিযামুল মুলুক তুসি বারকিয়ারোককে সুলতানের স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা দেন। বারকিয়ারোক মালিক শাহের অন্য আরেক স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। তাই সুলতানের শাহাদাতের পর পুত্র মাহমুদের মা তুর্কান খাতুন বারকিয়ারোককে অগ্রাহ্য করে নিজের ছেলেকে মালিক শাহের উত্তরাধিকার ঘোষণা দেয়। অথচ মাহমুদের বয়স ছিল তখন মাত্র চার আর বারকিয়ারোকের চোদ্দ।

তুর্কান খাতুন বিষয়টা করেছিলেন খুবই সঙ্গোপনে এবং কৌশলে। তিনি সুলতান মালিক শাহের মৃত্যুর বিষয়টা গোপন রেখে সকলের অজ্ঞাতে তাঁর শবদেহ [৮]*ইস্পাহান* পাঠিয়ে দেন। দাফনকার্য সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি তার পুত্র মাহমুদকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে বারকিয়ারোকের হিতাকাঙ্ক্ষী সভাসদ ও আমীরগণ তাকে রাজমুকুট পরিয়ে মসজিদে মসজিদে তাঁর নামে খুতবা চালু করেন।

বারকিয়ারোক তুর্কান খাতুনের এহেন কর্মকাণ্ডের কথা জানতে পেরে *ইস্পাহান* অভিমুখে সেনাসমাবেশ ঘটান।

---

৮. এটি ইরানের রাজধানী তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত একটি অতিপ্রাচীন শহর। [উইকিপিডিয়া]

তুর্কান খাতুন মোকাবেলায় না গিয়ে সন্ধির পথ বেছে নেন এবং সমগ্র সামাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করে দেন। *ইস্পাহান* ও এর আশপাশের অঞ্চলগুলো তার সন্তান মাহমুদকে দিয়ে সাম্রাজ্যের বাকি অংশ সোপর্দ করেন বারকিয়ারোককে।

কিছুকাল পরই মাহমুদ ইন্তেকাল করেন। এতে করে পুরো সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে যান সুলতান বারকিয়ারোক। তাঁর মৃত্যুর পর ইরাক-ইরানের সুলতান হন তাঁর ভাই মুহাম্মদ সালজুকি।

আমীর মওদুদের শাহাদাতের পর সুলতান মুহাম্মদ সালজুকি আমীর মওদুদের পুত্র মাসউদকে মসুলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর ইমাদউদ্দীনকে নবনিযুক্ত আমীর মাসউদের অধীনে কাজ করার নির্দেশ দেন। মুসলিম জাহানের দুর্ভাগ্য যে, কিছুদিনের মধ্যেই সুলতান মুহাম্মদ সালজুকিও মৃত্যুবরণ করেন। তখন সুলতান মুহাম্মদ সালজুকির ছেলে মাহমুদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

তবে মসুলের গভর্নর মাসউদ সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেন। সুলতান মাহমুদ এই বিদ্রোহ শক্তহাতে দমন করেন। এরপর মাসউদের স্থানে গভর্নর নিযুক্ত করেন বারসাকিকে। আর যেহেতু ইমাদউদ্দীন সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে মাসউদকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাই সুলতান মাহমুদ

ইমাদউদ্দীনকে স্বপদে বহাল রেখে আমীর বারসাকির নায়েব নিযুক্ত করেন।

বারসাকি বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। ছিলেন রণাঙ্গনের অমিততেজি বীর। আমীর মওদুদের মতো তাঁর মধ্যেও ক্রুসেডারদের প্রতি ক্ষোভের অগ্নিলাভা টগবগ করত। এমন মহান সিপাহসালারের অধীনে থেকে ইমাদউদ্দীনও নিজের লালিত স্বপ্ন ও যোগ্যতা বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। মসুলের গভর্নর নিযুক্ত হয়েই আমীর বারসাকি খ্রিষ্টানদের দখলে থাকা শহর [৯]*সমাসাত* আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। *সামসাত* শহরটি ছিল একটি সুরক্ষিত দূর্গ। খ্রিষ্টানদের শক্ত ঘাঁটি।। তিনি যখন ইমাদউদ্দীনের কাছে এই ব্যাপারে মতামত জানতে চান, ইমাদউদ্দীন আনন্দের সাথে রাজি হয়ে যান এবং আক্রমণের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু করে দেন। কারণ তিনি তো এ-ই চাচ্ছিলেন যে, অধিকৃত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য যেন দ্রুত প্রয়াস চালানো হয়।

বারসাকি এবং ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সেনাবাহিনী নিয়ে ক্রুসেডারদের দূর্গ *সামসাত* অভিমুখে রওনা হন। সেখানে ফ্রান্সের বিশাল এক বাহিনী বিদ্যমান ছিল আগে থেকেই। তাছাড়া আর্মেনিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলো থেকে আসা সশস্ত্র মিলিশিয়ারাও ছিল। *সামসাত*

৯. সামসাত তুরস্কের আদিয়ামান জেলার অন্তর্গত একটি ছোট শহর। [উইকিপিডিয়া]

শহরের উপকণ্ঠে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে বারসাকি এবং ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলিম বাহিনী আশপাশের অনেক দূর্গ জয় করে নেয়।

যুদ্ধে ইমাদউদ্দীনের বীরত্ব ও সাহসিকতায় বরাবরের মতো সবাই অত্যন্ত প্রভাবিত হয়। সুলতান মাহমুদ সালজুকি খুশি হয়ে ইমাদউদ্দীনকে [১০]*ওয়াসেত* শহরের জায়গির দান করেন। পাশাপাশি তাকে *বসরা* শহরের গভর্নরও নিযুক্ত করেন।

ইতোমধ্যে মসুলের অবস্থা কিছুটা বিরূপ হয়ে যায়। তখন আমীর বারসাকি সুলতান মাহমুদ সালজুকির কাছে নিবেদন করেন যাতে তিনি ইমাদউদ্দীনকে মসুলে পাঠিয়ে দেন। কারণ, মসুলের এই পরিস্থিতিতে একজন সুযোগ্য সহযোগীর তাঁর খুব প্রয়োজন।

সুলতান মাহমুদ সালজুকি যখন এই বিষয়ে ইমাদউদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন, তখন ইমাদউদ্দীন মসুল যাওয়ার পরিবর্তে সুলতানের কাছে থাকাকেই

---

১০. ওয়াসেত শহরটি ইরাকের একটি প্রদেশ। এটি দেশটির পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। আরবি শব্দ ওয়াসেত অর্থ- মধ্যস্থল, থেকে এই প্রদেশটির নাম এসেছে। নামকরণটি যথার্থ। কেননা প্রদেশটি বাগদাদ ও বসরা শহরের মাঝখানে দজলা বা তাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত। এই প্রদেশের রাজধানী-শহর আল-কুত। [উইকিপিডিয়া]

প্রাধান্য দেন। এবং কিছুকাল সুলতানের দরবারে একজন সম্মানিত আমীর ও বিশ্বাসভাজন সালার হিসেবে কাটান।

কিছুদিন পর সুলতান বাগদাদ সফরে বের হন। এ সফরে ইমাদউদ্দীন একজন নায়েব এবং বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে সুলতানের সফরসঙ্গী হন। ঠিক তখনই মসুল থেকে আমীর বারসাকির ইন্তেকালের সংবাদ আসে। বারসাকির পর তার নাবালেগ পুত্র জাদেলি মসুলের আমীর নিযুক্ত হন।

যতদিন পর্যন্ত আমীর বারসাকি মসুলের গভর্নর ছিলেন, ততদিন ক্রুসেডাররা মসুলের দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পায়নি। কিন্তু আমীর বারসাকির মৃত্যুর পর ক্রুসেডাররা খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করে।

গভর্নর হিসেবে মসুলে

মসুলের সর্বজনবিদিত ও সম্মানিত দুইজন আলেম, ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে যাদের বাহাউদ্দীন শাহরাযোরী এবং সালাহউদ্দীন মুহাম্মদ নামে স্মরণ করা হয়েছে; তাঁরা অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁরা ভাবেন, এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে যে কোন সময় ক্রুসেডাররা আকস্মিক আক্রমণ করে মসুল দখল করে ফেলবে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পেরে তাঁরা সুলতান মাহমুদ সালজুকির দরবারে উপস্থিত হন।

বিদ্যমান পরিস্থিতির কথা বিস্তারিত জানিয়ে সুলতানের কাছে একজন সুযোগ্য এবং সাহসী সালারকে গভর্নর নিযুক্ত করার আবেদন করেন। যিনি মসুলের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবেন। কারণ মসুলের অনতিদূরেই ছিল ক্রুসেডারদের ঘাঁটি।

বিষয়টি সুলতানকে চিন্তায় ফেলে দেয়। তিনি পরামর্শের জন্য এই দুইজন আলেম ছাড়াও সাম্রাজ্যের সকল গভর্নর এবং সালারদের তলব করেন। পরামর্শ সভায় সকলেই ঐকমত্য হয়ে ফায়সালা দেন যে–মসুলের গভর্নর হিসেবে এবং সেখানে অবস্থান করে ক্রুসেডারদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর বিকল্প কেউ নেই। তিনিই পারবেন উদ্ভূত পরিস্থিতি দক্ষতার সাথে সামাল দিতে।

সুলতান মাহমুদ সম্মানিত আলেম উলামা এবং সকল সালারদের মতামতের ভিত্তিতে ইমাদউদ্দীনকেই [১১]মসুলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এর সাথে তাকে *আতাবেক* উপাধিতে ভূষিত করেন। শুধু তাই নয় দুই শাহজাদাকে দীক্ষা লাভের জন্য ইমাদউদ্দীনের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন।

আতাবেক তুর্কী শব্দ। যার অর্থ: দীক্ষাগুরু, শ্রদ্ধাভাজন, পৃষ্ঠপোষক।

---

১১. ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী মসুলের শাসনভার লাভ করেন ৫১১ হিজরী সনে। [সিয়ারু আলামিন নুবালা: খ:১৫;পৃ:৩৮]

মুসলিম জাহানে এই উপাধি সর্বপ্রথম সুলতান মালিক শাহ সালজুকি তাঁর আস্থাভাজন উজির খাজা নিযামুল মুলুক তুসিকে দেন। পরবর্তীতে এটি সালজুক সাম্রাজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাধি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই উপাধি সেই সকল আমীরদের কেবল দেয়া হতো, যারা রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে সম্মানিত এবং সর্বজনগৃহীত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতেন।

প্রথম দিকে এই উপাধি যারা লাভ করত নওজোয়ান শাহজাদাদের দীক্ষা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁদের উপর পড়তো। পরবর্তীতে এই উপাধিধারী ব্যক্তিরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। এতে একসময় এই উপাধি সালতানাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়। আর সেই উপাধি দ্বারাই সুলতান মাহমুদ ইমাদউদ্দীনকে ভূষিত করেন।

মসুলের আশপাশে ক্রুসেডারদের আস্ফালন ও অপতৎপরতা দিনদিন বেড়েই চলছিল এবং তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডও সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য এবং ক্রুসেডারদের সব ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য তখন মুসলমানদের এমন একজন সাহসী বীর মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল, যিনি ঐক্য এবং সাম্রাজ্যের ভিতকে সুসংহত করে মুসলিম জাহানের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন।

সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, উম্মাহ ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর মতো কাউকে পেয়ে যায়। ইমাদউদ্দীনকে তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ হিসেবে গ্রহণ করেন।

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সর্বপ্রথম মসুলের প্রশাসনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাসে মনোযোগী হন। এরপর সেসব আমীরদের বিষয়ে মনোনিবেশ করেন, কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে যারা স্বায়ত্তশাসন ঘোষণার পায়তারা করছিল এবং অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বিরোধকে চাঙ্গা করছিল। আর তাদের এই বিরোধের সুযোগে ক্রুসেডাররা বিশৃঙ্খলার নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করে পরিস্থিতিকে দিনদিন সঙ্গীন করে তুলছিল।

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সেনাবিভাগ সুবিন্যস্ত করতে কয়েকমাস সময় নেন। বিভিন্ন পদে ব্যাপকভাবে রদবদল করেন। পুরাতন দায়িত্বশীলদের সরিয়ে একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের পদে নিয়োগ দেন।

আমীর হাজিব (রক্ষী প্রধান) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। তাতে নিয়োগ দেন সালাহউদ্দীন মুহাম্মদকে। মসুল-দূর্গের দূর্গপ্রধান নিযুক্ত করেন নাসিরউদ্দীনকে। কাজীউল কুজাত (প্রধান বিচারপতি) বানান সম্মানিত আলেম বাহাউদ্দীন আবুল হাসানকে। এভাবেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে ব্যাপক রদবদল করে পুরাতন ও দুর্বল আমীরদের স্থানে একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়োগ দেন।

বলা হয়, ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর মধ্যে আল্লাহ তাআলা যে পরিমাণ সাহসিকতা এবং দীনি-গায়রত ও আত্মমর্যাদাবোধ দিয়েছিলেন, খুব কম মুসলিম বীর মুজাহিদের মধ্যেই তা পাওয়া যায়। তাঁর ঈমানি জযবা তো এমন ছিল যে, তিনি নিজ বাহিনীর সেনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতেন। কখনো যুদ্ধ করতে করতে বাহিনী থেকে এগিয়ে গিয়ে দুশমনের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যেতেন। নিজে তরবারি হাতে একাকি লড়াই করে দুশমনদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতেন।

তাঁর নির্ভীকতা এবং অতুলনীয় সাহসিকতার কারণে তাঁর নাম শুনলেই ক্রুসেডারদের শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যেত। ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার তড়প তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। এই তড়প ও প্রবল আগ্রহ এবং আত্মমর্যাদাবোধই তাকে প্রচণ্ড দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও ক্রুসেডারদের মহাশক্তির সাথে মোকাবেলার সাহস যুগিয়েছে।

তিনি ইচ্ছা করলে মসুলের গভর্ণর হয়ে অন্যান্য মুসলিম শাসকদের মতো আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ সায় দেয়নি যে, তাঁর সীমানার আশেপাশে মুসলমানরা দুঃখ-যাতনায় পিষ্ট হবে, নিপীড়িত হবে—আর তিনি তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আমোদে মজে থাকবেন।

বস্তুত তিনি নিজের জীবনকে মুসলমানদের সুরক্ষা এবং ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করেই তিনি শক্তিশালী দুশমন এবং তাগুতি শক্তির মোকাবেলা করার দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন। মূলকথা হচ্ছে–জিহাদের ময়দানের সঙ্গে ইমাদউদ্দীনের আন্তরিক ভালোবাসা তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তিনি প্রায়শই বলতেন– 'মখমলের গালিচা আর রেশমের নরম বিছানার চেয়ে ঘোড়ার পিঠের জিন, চিত্তাকর্ষক গান-বাজনার চেয়ে ময়দানের শোরগোল এবং অনিন্দ্য সুন্দরী নারীদের মিষ্টি সুরের মূর্ছনা থেকে তরবারির ঝঙ্কারই আমার কাছে অধিক প্রিয়।'

মোটকথা, মসুলের গভর্নর হয়েই ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ মেয়াদী লড়াইয়ের জন্য জোরেশোরে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। লোকেরা ব্যাপক আবেগ উদ্দীপনার সাথে তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। কারণ তারা জানত, এই বীর-শার্দুলই ক্রুসেডারদের নাস্তানাবুদ করতে পারবে। তাছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্যতাও মানুষকে তাঁর দিকে আকর্ষিত করত।

ব্যক্তিত্বে বলীয়ান

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, 'ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সুদর্শন ছিলেন। গায়ের রঙ ছিল হালকা বাদামি। চোখ দুটো ছিল বড় বড়; নীরব শান্ত সাগর যেন। একহারা লম্বা এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের প্রভাব এমন ছিল যে, তাঁর সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলার কারো হিম্মত হত না। তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলার কেউ সাহস পেত না।

তাঁর নাম শুনেই বড় বড় অবাধ্য আমীররা পর্যন্ত ভয়ে মিঁইয়ে যেত। একবার এক প্রহরী পাহারারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘটনাক্রমে তখন ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী পায়চারী করতে বের হন। তিনি সে প্রহরীর শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। প্রহরী চোখ খুলে ইমাদউদ্দীনকে তার সামনে দণ্ডায়মান দেখে বেহুঁশ হয়ে যায়। পরে লোকেরা হুঁশ ফেরানোর চেষ্টা করে। তবে ইতোমধ্যে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

৫১২ হিজরীতে সুলতান মাহমুদ সালজুকি ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীকে মসুলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার ঠিক একবছর আগে মসুলেই তাঁর পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করে। তিনি পুত্রের নাম রাখেন নুরউদ্দীন। ইতিহাসে যিনি সুলতান নুরউদ্দীন জেঙ্গী নামে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

নুরউদ্দীন তাঁর জন্য সৌভাগ্যের সিতারা হয়েই উদিত হয়েছিলেন। কারণ তাঁর জন্মের মাত্র একবছরের মাথায় ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী মসুলের গভর্নর নিযুক্ত হন। নুরউদ্দীনের মা ছিলেন মসুলের সাবেক গভর্নরের ছেলে নাসিরউদ্দীনের কন্যা।

সুলতান ইমাদউদ্দীনের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ছিল, তিনি অতীতে ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা মুসলমানদের যে সমস্ত অঞ্চল ছিনিয়ে নিয়েছে, সেগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হবেন।

তাঁর শাসনপদ্ধতি

ক্রুসেডারদের সাথে এক দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগকে ঢেলে সাজানোর দিকে মনোনিবেশ করেন। গুরুত্বপূর্ণ এই দুই বিভাগে আমূল সংস্কার করে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান এবং একটি সুশৃঙ্খল অবকাঠামো তৈরী করেন। বাস্তবিকপক্ষে একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার জন্য ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থা সরকারী এবং বেসরকারী সবদিক থেকেই খুব গুরুত্ব বহন করে।

মুসলমানরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনে এবং মানবিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে যেসব মহান কর্মকাণ্ড সম্পাদন করেছেন; সেগুলোর শীর্ষভাগে রয়েছে এই ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

ইসলামপূর্ব সময়ে পৃথিবীতে অনেক সাম্রাজ্য ছিল, যারা নিজেদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে খুব গর্ব করত। কিন্তু তাদের কারোরই ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থাকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগের রূপ দেয়ার সুযোগ হয়নি। মানবসভ্যতার ইতিহাসে নিয়মতান্ত্রিক ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য কেবল মুসলমানদেরই। মুসলমানদের এই খেদমত তদানীন্তন বিশ্বসভ্যতার উপর এক বড় অনুগ্রহ। যে অনুগ্রহের কথা সভ্যতা এবং মানবজাতি স্মরণ করতে বাধ্য।

ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠার ভাবনা সর্বপ্রথম দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাযি.-এর ভাবনায় আসে। কিন্তু তখন ডাকবিভাগ শুধুমাত্র সরকারী চিঠিপত্র আদান-প্রদানের কাজেই ব্যবহৃত হত। এই উদ্দেশ্যে পুরো সাম্রাজ্যজুড়ে রাস্তায় আলাদা চৌকি প্রতিষ্ঠা করা হয়। হাজার হাজার কাসিদ ও বার্তাবাহক নিযুক্ত করা হয়। যারা দ্রুততার সঙ্গে খিলাফাহর কেন্দ্রে সবধরনের খবরাখবর পৌঁছে দিত। এই বার্তাবাহকরা সাধারণত উট-ঘোড়ায় সফর করত। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া পথে কোথাও বিরতি নিত না। রাস্তার প্রতিটা চৌকি থেকেই তারা তাজাদম তাগড়া বাহনজন্তু পেত। যাবতীয় আহার্য এবং পানীয় তাদের জন্য চৌকিগুলোতে বিদ্যমান থাকত। এভাবেই মদীনায় অবস্থান করেই উমর রাযি. দূর-দূরান্তের সামগ্রিক অবস্থা ও খবরাখবর অল্প সময়েই পেয়ে যেতেন।

হযরত উসমান এবং আলী রাযি.-এর খেলাফতকালেও এই পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে তিনি দুভাগে বিভক্ত করে এতে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। সরকারী ও বেসরকারী নামে দুটি বিভাগের সৃষ্টি হয়। সরকারী বিভাগ কেবল সরকারী খবরাখবরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তাছাড়া সাম্রাজ্যের সর্বত্র ঘটমান বিষয়আসয় কেন্দ্রে যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও এই বিভাগের ওপর ন্যাস্ত ছিল। আর বেসরকারী বিভাগ ছিল সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। এই বিভাগের দায়িত্বশীলরা মানুষের চিঠিপত্র এবং জিনিসপত্র একটা নির্দিষ্ট স্থানে একত্র করত। তারপর প্রাপকের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দিত। আর এই বিভাগের দায়িত্বশীলদের ওপর গোয়েন্দাবিভাগের লোকেরা বিশেষভাবে নজরদারি করত; যাতে কোনো ধরনের খেয়ানত না হয়।

আমীর মুআবিয়ার পর খলিফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক এই ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরো উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি মুসলিম জাহানের সর্বত্র ডাকবিভাগকে জালের মতো বিছিয়ে দিয়েছিলেন। যার মধ্যে বড় বড় ডাকঘর ছিল বত্রিশটি।

শহরে যেদিন ডাকের চিঠিপত্র ইত্যাদি পৌঁছুত, সেদিন ঘোষণা করে দেয়া হত যে, যাদের ডাক এসেছে তারা যেন বড় ডাকঘরে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়ে নিজেদের

চিঠিপত্র, পার্সেল উসুল করে নেয়। ব্যস, লোকেরা নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হয়ে নিজেদের চিঠিপত্র ও জিনিসপত্র বুঝে নিত। এই ডাকব্যবস্থা যে শুধুমাত্র শহরে বিদ্যমান ছিল তা নয়; বরং গ্রামাঞ্চলেও এর সুব্যবস্থা ছিল। সেখানে জুমআর নামাজের পর ডাক মারফত প্রেরিত চিঠিপত্র বণ্টন করা হত। ডাক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়ার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। যারা সরকারীভাবে নির্দিষ্ট বাহন, খচ্চর কিংবা উটে সফর করত।

খলিফা আব্দুল মালিকের পর যখন আব্বাসীয়দের শাসনামল এল, তারা এই ডাকব্যবস্থায় বিশেষ প্রযুক্তি যুক্ত করে এতে আরো উন্নতি সাধন করেন।

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে বতুতার তথ্যমতে–আব্বাসীয়দের যুগে কেবল ডাকবিভাগের জন্যই বছরে এক লক্ষ ঊনষাট হাজার একশ দিনার খরচ করা হতো।

ঐতিহাসিক জারজি যায়দান লেখেন, সে যুগে কেবল ডাকবিভাগের জন্যই তিরানব্বই শ্রেণীর কর্মচারী কাজ করতো। ডাক পৌঁছানো এবং বণ্টনপর্ব অশ্বারোহীদের মাধ্যমে সম্পাদন করা হত। খচ্চরও মোটামুটি ব্যবহৃত হত। আর যুদ্ধ কবলিত অঞ্চলগুলোতে তীরের সাহায্যে সংবাদ ও বার্তা আদানপ্রদান করা হত।

পথে পথে চৌকি ছিল, যেখান থেকে বাহনজন্তু পরিবর্তন করে তাজাদম ও তাগড়া বাহন নেয়ার ব্যবস্থা ছিল। ডাকবিভাগের জন্য ডাকপিয়ন ও কর্মকর্তা বাছাইয়ে কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্ট সহ্য করতে পারার বিষয়টাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হত। এরা দিনরাত মিলিয়ে ষাট মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখত।

আব্বাসীয়দের যুগে জনসাধারণের উপকারার্থে সব কেন্দ্রীয় শহরগুলো যেমন– মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, হালাব/আলেপ্পো, মসুল, দামেশক, বাগদাদ, হোমস, গজনি, নিশাপুর, ইস্কান্দারিয়াসহ অন্যান্য বড় শহরগুলোতে ডাকঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। আর সেগুলোর অধীনে অসংখ্য ছোট ছোট ডাকঘর কাজ করত। সরকারী এবং গোয়েন্দাবিভাগের ডাকব্যবস্থা ছিল ভিন্ন। ডাকঘরকে *দিওয়ানুল বারীদ* নাম দেয়া হয়েছিল। আর প্রধানকর্মকর্তাকে *সাহিবুল বারীদ* বলা হত। এই বিভাগগুলো খুব দক্ষতা ও সতর্কতার সাথেই গোয়েন্দাগিরি ও সংবাদ পৌঁছানোর কাজ আঞ্জাম দিত। যখন সালজুকি সুলতানদের যুগ এল, বিখ্যাত সালজুকি সুলতান আলাপ আরসালান এবং সুলতান মালিক শাহ সালজুকি প্রমুখও ডাকব্যবস্থার উন্নতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন এবং এই ব্যবস্থাকে একটি মানসম্মত স্তরে উপনীত করেন। পরবর্তী সুলতানরাও ডাকব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন করেন।

মোটকথা, মুসলমানরা ডাকব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার যে অভিনব নিয়ম-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন- তা বর্তমান প্রযুক্তির যুগে উন্নত জাতিগোষ্ঠীর জন্যও মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

আছারিব বিজয়

সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থা এবং গোয়েন্দাবিভাগকে সুবিন্যস্ত করার পর মূল কাজ শুরু করেন। সর্বপ্রথম তিনি ক্রুসেডারদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্য দুটি শহরকে টার্গেট করেন। একটি হচ্ছে *আছারিব* আর অন্যটি *হারিম*। *আছারিব* শহর এবং দুর্গের অবস্থান হচ্ছে দামেশক থেকে চার মাইলের দূরত্বে এন্তাকিয়ার দিকে চলে যাওয়া মহাসড়কের পাশে। এই দুর্গটি ক্রুসেডারদের একটি সুবিশাল ঘাঁটি ছিল। আছারিবে ক্রুসেডারদের আধিপত্যের কারণে দামেশক এবং তার আশপাশের মুসলমানরা ছিল অসহায়।

ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের বর্ণনানুযায়ী, আছারিবে ক্রুসেডারদের দখলদারিত্ব মুসলমানদের গলায় ফাঁস লাগানোর মতো অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

এ সকল বিষয় সামনে রেখে সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী ক্রুসেডার অধিকৃত শহর আছারিবকে পুনরুদ্ধার করার দৃঢ় সংকল্প করেন। তাঁর কিছু সালার এবং সহচর

এ মুহূর্তে তাকে অভিযান পরিচালনা না করার পরামর্শ দেন। কারণ *আছারিব* দূর্গটি অত্যন্ত মজবুত ও দুর্ভেদ্য ছিল। শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে ক্রুসেডারদের চেয়ে তারা নিজেদের সংখ্যা ও শক্তি উভয়টাকেই তুচ্ছ মনে করছিল। কিন্তু সিংহ-হৃদয় বীর-শার্দুল ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী তাদের সকল আশঙ্কা, আতঙ্ক একপাশে রেখে আক্রমণ করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

আছারিব দূর্গের ক্রুসেডাররা অনেক বাড় বেড়েছিল। তাদের দৌরাত্মে মুসলমানরা ছিল অতিষ্ঠ। প্রায়ই তারা মুসলমানদের শহর-বন্দরে আক্রমণ করত। মুসলমানদের ঘরবাড়িও লুটপাট করত। এই দূর্গের অভ্যন্তরে ফ্রান্সিসরা ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশের খ্রিষ্টান মিলিশিয়াদের উপস্থিতি ছিল। এরা সর্বদা মুসলমানদের জনজীবন অতিষ্ঠ করে বিকৃত আনন্দ অনুভব করত। এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তারা গর্বের সাথে সম্পাদন করত।

এসব দিক বিবেচনায় দেখা যায়, আছারিব দূর্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী ও সঠিক ছিল। কারণ এই শহরের চারপাশের সব অঞ্চলগুলো মুসলিম অধ্যুষিত। ক্রুসেডারদের নিপীড়নে যারা সদা আতঙ্কিত থাকত। তাদের অত্যাচারে মুসলমানদের নাভিশ্বাস উঠছিল। এসব কারনে সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী তাদের শায়েস্তা করার ইচ্ছা করেছিলেন।

আছারিবে ক্রুসেডারদের বাহিনী ছিল মুসলিম বাহিনীর চেয়ে কয়েকগুণ বড়। তাই হামলার ফলাফল হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তিনি আছারিব আক্রমণের ব্যাপারে অনঢ় ছিলেন।

এদিকে জেঙ্গীর *আছারিব* অভিযানের সংবাদ জরুসালেম পৌঁছে যায়। সম্রাট বল্ডুইন তখন জেরুসালেমের শাসক। জেরুসালেম তখন খ্রিষ্টানদের দখলে ছিল। পরবর্তীতে যা ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর পুত্র সুলতান নুরউদ্দীনের পর মুসলিম জাহানের অবিসংবাদিত সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী পুনরুদ্ধার করেছিলেন। বল্ডুইন যখন সংবাদ পেলেন যে, মুসলমানদের এই নতুন আমির *আছারিব* আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখনই সে এক বিশেষ পরামর্শসভার ডাক দেয়। যার উদ্দেশ্য ছিল ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল নির্ধারণ।

অধিকাংশ সভাসদ ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর এই আক্রমণকে গুরুত্বই দিলেন না। কেউ কেউ বলে উঠলো, মহামান্য! এসব চুনোপুটিকে গুরুত্ব না দিয়ে চুপচাপ জেরুসালেমেই থাকি। *আছারিব* তো আমাদের মজবুত দূর্গ। তাছাড়া সেখানে শক্তিশালী এক বাহিনী বিদ্যমান আছে। মুসলমানদের আমীর ইমাদউদ্দীন দূর্গ বিজয় করা তো দূরে থাক, দূর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সঙ্গে মাথা ঠুকে ব্যর্থ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। তবে সম্রাট বল্ডুইনের

বয়োবৃদ্ধ, অভিজ্ঞ একজন সভাসদ তাকে সতর্ক করে বলল, মুসলমানদের এই নওজোয়ান আমীর তাবারিয়া শহরের লড়াইয়ে তাদের নাস্তানাবুদ করেছিল। এখন সে মসুলের গভর্নর। সুতরাং একে কোনভাবেই তুচ্ছ ভাবা উচিত হবে না। তাকে তুচ্ছ ভাবা বরং বোকামিই হবে। যার জন্যে পরে কড়া মাশুল দেয়া লাগতে পারে।

সম্রাট বল্ডুইন তার কথায় নড়েচড়ে বসলেন এবং তৎক্ষণাৎ একটি শক্তিশালী বাহিনী আছারিবের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন।

অন্যদিকে সুলতান ইমাদউদ্দীনের গুপ্তচররাও খুব দ্রুততার সঙ্গে সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছিল। কারণ তিনি আগে থেকেই ডাক ও যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত করে রেখেছিলেন। দুশমনের প্রতি মুহূর্তের গতিবিধির সংবাদই গুপ্তচররা সুলতানকে অবগত করছিল।

সুলতান যখন জানতে পারলেন, আছারিবের সাহায্যের জন্য জেরুসালেম থেকে এক বিশাল বাহিনী ধেয়ে আসছে, তখন তিনি পরিকল্পনা করলেন, এই দুই বাহিনীকে কিছুতেই মিলতে দেয়া যাবে না। অর্থাৎ, জেরুসালেম থেকে প্রেরিত সাহায্যফোর্সকে আছারিব পৌছার আগেই থামাতে হবে।

জেঙ্গী নিজের জানবাজ মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে জেরুসালেম থেকে প্রেরিত বাহিনীর দিকে রওয়ানা

করেন। ওদিকে জেরুসালেমের বাহিনীটি দুলকি চালে ধীরলয়ে এগিয়ে অসছিল। বাহিনীর সেনাসদস্য থেকে নিয়ে সালার সকলেই বেশ উৎফুল্ল। তাদের কল্পনায়ও আসেনি যে, ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর ফাঁদে তারা পা দিয়েছে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, ইমাদউদ্দীন আর এমন কী? মসুলের গভর্নর মাত্র। এমন গভর্নরদের ছোটখাটো একটা বাহিনী থাকে; ইমাদউদ্দীনেরও হয়ত এমন একটা বাহিনী আছে! যে বাহিনী নিয়ে সে আছারিবের উপর আক্রমণ করবে। দূর্গের মজবুত ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর টপকানোর মতো সরঞ্জাম সে পাবে কোত্থেকে? প্রাচীরের উপর আক্রমণ করতে করতেই তার স্বাদ মিটে যাবে। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে অবশেষে ফিরে যাবে।

তবে তাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে এক রাতে ইমাদউদ্দীন তাঁর বাহিনী নিয়ে মৃত্যুর দূত হয়ে জেরুসালেম বাহিনীর সামনে আবির্ভূত হন এবং সর্বশক্তি নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইউরোপের বাহিনীটি যেন চোখে শর্ষেফুল দেখতে পায়। সুলতান ইমাদউদ্দীন পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমেছিলেন।

মরুভূমির বিদঘুটে রাত তাদের জন্য ভয়াল হয়ে দেখা দেয়। সে রাতে মুসলিম বাহিনী এবং ক্রুসেডারদের মধ্যে ইতিহাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ক্রুসেডাররা আপ্রাণ চেষ্টা করে জেঙ্গীর বাহিনীকে পরাস্ত করে পালিয়ে যেতে বাধ্য করতে। তবে, তাদের

চেষ্টা হতাশা ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ ইমাদউদ্দীন এবং তাঁর বাহিনী বাজপাখির মতো ক্রুসেডারদের খুবলে খুবলে খাচ্ছিল। ফলে বিস্তৃত ময়দান ক্রুসেডারদের লাশের ভাগাড়ে পরিণত হয়।

আছারিবের অনতিদূরেই রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী ক্রুসেডারদের অহমিকা ধূলোয় মিশিয়ে চরমভাবে তাদের পরাজিত করেন। আছারিবের যুদ্ধকে *পবিত্রযুদ্ধ* মনে করে ক্রুসেডারদের অনেক বড় বড় সালার এবং আমীর এ বাহিনীতে শামিল হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই মুসলিম বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়। আর জীবিতরা হয় বন্দি।

এ যুদ্ধে নিহত ক্রুসেডারদের সংখ্যা এতো বেশি ছিল যে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের ভাষ্যমতে—যুদ্ধ সমাপ্তির ষাট/সত্তর বছর পরও এ অঞ্চলে তাদের হাড্ডি এখানে সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যেত।

জেরুসালেম থেকে আগত বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে ইমাদউদ্দীন *আছারিব* দূর্গের দিকে রোখ করেন। এই দূর্গ একসময় মুসলমানদের দখলে ছিল। নিকট অতীতে ক্রুসেডারদের হাতে এর পতন ঘটে। ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী যেভাবেই হোক এটা পুনরুদ্ধারে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন।

দূর্গের অভ্যন্তরে স্থানীয় খ্রিষ্টানরা ছাড়াও ইউরোপে বড় বড় দেশগুলোর বাছাই করা তীরন্দাজরা বিদ্যমান ছিল। মুসলিম বাহিনী দূর্গের প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হলে তারা প্রাচীরের উপর অবস্থান নিয়ে বৃষ্টিরমতো তীর নিক্ষেপ করতে লাগল। তবে সুলতান এতটাই জযবা এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা ছিলেন যে, দূর্গের নিকটে এসেই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সৈন্যসহ দূর্গের প্রাচীর টপকে কেল্লায় ঢুকে পড়েন। মুসলিম বাহিনীর তরবারীর কারিশমায় নিমিষেই দূর্গের রক্ষীদের ধরগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। তাদের অধিকাংশই বেঘোরে মারা পড়ে। এভাবেই সুলতান *আছারিব* দূর্গ বিজয় করে শহরের শীর্ষস্থানে মুসলিম বাহিনীর পতাকা উড্ডীন করেন।

আছারিব বিজয়ের ফলে ক্রুসেডারদের মনে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর নির্ভীকতা ও সাহসিকতার ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় এবং ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা প্রথমদিকে প্রায়ই মুসলমানদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করে বসত। সুলতান ইমাদউদ্দীনের অধীন অঞ্চলগুলোতেও তারা কখনো কখনো অনুপ্রবেশ করার দুঃসাহস প্রদর্শন করত। কিন্তু সুলতান আছারিবে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার পর, সুলতানের অধীন অঞ্চলগুলোর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও তাদের হয়নি। পূর্বে যখন এই দূর্গটি মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল, তখন এর নাম

ছিল *আছারিব*। কিন্তু খ্রিষ্টানরা দখল করার পর তার নাম পরিবর্তন করে রাখে *ক্রেপ*।

আলেপ্পোর নয় মাইল দূরত্বে এন্তাকিয়াগামী মহাসড়কের পাশেই এটি অবস্থিত। *আছারিব* আরবী শব্দ *সরব* থেকে নির্গত; যার অর্থ হচ্ছে বকরির চর্বি। বর্তমানে শহরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। তবে তার অদূরেই *আছারিব* নামে একটি ছোট্ট গ্রাম রয়েছে।

আছারিব বিজয়ের পর সুলতান কালবিলম্ব না করে অন্য আরেকটি বড় দূর্গ *হারিমে*র দিকে অগ্রসর হন। এটিও ক্রুসেডারদের একটি মজবুত দূর্গ ছিল। এখানে যে বাহিনী ছিল খ্রিষ্টানদের, তারা আশপাশের মুসলমানদের জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলত। দুর্যোগ সৃষ্টি করত। এই কারণেই সুলতান ইমাদউদ্দীন *হারিম* দূর্গের ক্রুসেডারদের শায়েস্তা করার সংকল্প করেন। সুলতান সৈন্যসহ ক্ষিপ্র গতিতে সেই দূর্গের দিকে এগিয়ে যান এবং তা অবরোধ করেন। দূর্গের অভ্যন্তরের ক্রুসেডবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর সৈন্যদের চেয়ে বেশি ছিল। কিছুদিন তারা দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করে। কিন্তু সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর অবিরাম বজ্রাঘাতে তাদের মনোবল ভেঙে যায়। অবশেষে তারা পরাজয় মেনে সুলতানের কাছে সন্ধির আবেদন জানায়।

হারিমের আশপাশের ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক সুলতানকে বাৎসরিক কর আদায়ের শর্তে তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন। হারিমের খ্রিষ্টানরা সুলতানের শর্ত কবুল করার সাথে সাথেই তিনি অবরোধ উঠিয়ে নেন।

ইতিহাসগ্রন্থ থেকে *হারিম* শহরটি সম্পর্কে যদ্দুর জানা যায়– *হারিম* আন্তাকিয়ার অদূরেই অবস্থিত একটি সবুজ-শ্যামল অঞ্চল। যেখানে সবুজ বৃক্ষরাজি এবং সুপেয় পানির প্রাচুর্য ছিল। আবার এই অঞ্চলে রোগবালাইয়েরও প্রাদুর্ভাব ছিল।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফিদা লেখেন, *হারিম* এটা আলেপ্পোর নিকটের একটি দূর্গ। যেখানে সারি সারি বৃক্ষরাজি রয়েছে এবং কাছেই রয়েছে সুপেয় পানির ঝরণা। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী।

অন্য আরেক ঐতিহাসিক ইবনে সাঈদ লেখেন, 'এই দূর্গে অবস্থিত খ্রিষ্টানদের কাছে প্রচুর সাজ-সরঞ্জাম ছিল। এছাড়া সেখানে বিশেষধরনের আনার চাষ হত, বাকলের বাইরে থেকেই যার লালদানাগুলো দেখা যেত।'

গৃহযুদ্ধের দাবানল

আছারিব এবং *হারিমের* ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর সুলতান ইমাদউদ্দীন ক্রুসেডার অধিকৃত অন্যান্য শহর ও অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধারের কাজে মনোনিবেশ করার ইচ্ছা

পোষণ করেন। কারণ ইতোমধ্যে আছারিব এবং হারিমের বিজয় ইমাদউদ্দীনের জোশ-জযবা এবং সাহস বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। মুসলিম বাহিনী ভালোভাবে বুঝে যায় যে, ক্রুসেডারদের পর্যুদস্ত করে ভূমধ্যসাগরের ওপারে তাড়িয়ে দেয়া কোনো কঠিন কাজ নয়।

তবে মুসলিম জাহানের ভাগ্যাকাশে দুর্ভাগ্যের ঘনঘটা যেন ভালোভাবেই জেঁকে বসেছিল। যার গ্রাস থেকে মুসলমানরা নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। যেসময়ে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন, ঠিক সেসময়েই সালজুকি শাসকদের রেষারেষি এবং আমীরদের অনৈক্য চরম আকার ধারণ করে। ইমাদউদ্দীনের শাসনাধীন অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে, তাঁর না চাওয়া সত্ত্বেও এই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে তিনিও জড়িয়ে পড়েন।

এই গৃহযুদ্ধ সূচনার ইতিহাস জানতে হলে আমাদের কিছুটা পেছনে ফিরে যেতে হবে। যতদিন মুসলিম জাহানের মহান সুলতান মালিক শাহ সালজুকি জীবিত ছিলেন, ততদিন না মোঙ্গলরা মুসলিমদের সীমানার দিকে শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপের সাহস করেছে; আর না ক্রুসেডাররা চোখ তুলে তাকানোর দুঃসাহস দেখিয়েছে। কিন্তু সুলতানের মহাপ্রয়াণের পর সাম্রাজ্য তাঁর সন্তান এবং ভাইদের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। যারা সর্বদা একে অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে

লিপ্ত থাকত। প্রত্যেক দিনই নিত্যনতুন সমস্যা এসে হাজির হত। একে অন্যকে ঘায়েল করার জন্য নানান রকম ফন্দিফিকির করত। এসবের কারণে মুসলমানদের ভেতরকার ঐক্য ক্রমেই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছিল।

গৃহযুদ্ধের ঐ দিনগুলোতেই সুলতান মালিক শাহের পুত্র সুলতান বারকিয়ারোক কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠছিলেন। তিনি ইরাক এবং ইরানে মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর অনেক চেষ্টা-কোশেশ করেন। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, এই চেষ্টা-কোশেশরত অবস্থায়ই তার ইন্তেকাল হয়। বারকিয়ারোকের ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র মালিক শাহ সুলতান হন। আর তারপর বারকিয়ারোকের ভাই মুহাম্মদ ইরাক-ইরানের সুলতান হন। মুহাম্মদ যখন সুলতান হন, তাঁর সময়ে তাঁর চাচা এবং আরেক ভাই যার নাম সানজার ছিল; এরা উভয়ে খোরাসান এবং [১২]মাওরাউননাহারের গভর্নর হন।

সুলতান মুহাম্মদের ইন্তেকালের পর তাঁর ভাই সানজার খুবই মর্মাহত হন এবং ভাইয়ের মৃত্যুশোকে কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি শহর-বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ রাখেন। এরই

---

১২. বিলাদু মাওয়ারাউননাহার বা মধ্য এশিয়া। ভূগোলবিদ ইয়াকুত আল হামাভী তার মুজামুল বুলদান গ্রন্থে বলেন, মাওয়ারাউননাহার দ্বারা উদ্দেশ্য আমু দরিয়া এবং সির দরিয়ার পার্শবর্তী দেশগুলো বর্তমানে পূর্ব তুর্কীস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কেমেনিস্তান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান এবং আজারবাইজান এ পাঁচ দেশ হল ট্রান্সঅক্সিয়ানের অঞ্চল।

মধ্যে হঠাৎ গুঞ্জন উঠে যে, সুলতান মুহাম্মদের উত্তরাধিকার হিসেবে তাঁর পুত্র সাম্রাজ্যের আসনে সমাসীন হচ্ছেন। এই সংবাদ সুলতান মুহাম্মদের ভাই সানজারের জন্য ছিল দুঃখজনক। কারণ বাস্তবিক অর্থে সুলতান হওয়ার হকদার এখন তিনিই।

সানজার এই সংবাদ জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। রাগে-ক্ষোভে তিনি সসৈন্যে ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। যেটি তার ভাতিজা সুলতান মাহমুদের অধীন ছিল।

অন্যদিকে সুলতান মাহমুদ যখন চাচা সানজারের সসৈন্যে ইরাকের দিকে ধেয়ে আসার সংবাদ শুনলেন তখন তিনি তাঁর কতিপয় আমিরকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে চাচা সানজারের কাছে এই বলে পাঠান যে, 'আপনি খোরাসান এবং মাওয়ারাউননাহার ফিরে যান। এর বিনিময়ে আমি আপনাকে বাৎসরিক দুই হাজার দিনার কর দেব।'

সানজার এ প্রস্তাব কবুল করেননি; বরং দ্রুতগতিতে শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। আর যে দূতদের সুলতান মাহমুদ প্রেরণ করেছিল, সানজার তাদের প্রতিউত্তরে বললেন, 'মাহমুদ এখনো শাহজাদা। তার ওপর তার উজির এবং সেনাপ্রধান ছড়ি ঘোরাবে– এটা আমার পক্ষে কস্মিনকালেও মেনে নেয়া সম্ভব নয়।'

সুলতান মাহমুদ যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর দেয়া প্রস্তাব সানজার নাকচ করে দিয়েছেন এবং বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন, তখন মাহমুদও তাঁর বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সানজারের আগেই তিনি *রায়* শহরে পৌঁছান। এবং বাহিনীর একটি ইউনিট সানজারের পথ রোধ করার জন্য পাঠান।

সুলতান মাহমুদ এই অগ্রগামী ইউনিটের প্রধান নিযুক্ত করেন তাঁর সালার আলী ইবনে উমরকে। অন্যদিকে সানজারও এই বাহিনীর মোকাবেলার জন্য একটি সেনা ইউনিট রওয়ানা করান। যার সালারের নাম আনযার।

অগ্রগামী উভয় ইউনিট পরস্পর মুখোমুখি হলে আলী ইবনে উমর আনযারকে ধমকিধামকি দিয়ে ভয় পাইয়ে দিতে সক্ষম হন। ফলে সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মোকাবেলা না করেই *জুরজান* ফিরে যান। যেখানে বাহিনীর অন্য সেনাদের সঙ্গে সানজার অবস্থান করছিলেন। সানজার যখন পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হলেন, তখন তিনি সসৈন্যে *রায়* শহরের অভিমুখী হন। সানজারের সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার। উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র ছাড়াও তার বাহিনীতে আঠারোটা যোদ্ধাহাতী ছিল।

অবশেষে *সাবা* নামক স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি হয়। চাচা-ভাতিজার মধ্যে এ ছিল এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ময়দানে যুদ্ধ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই

সানজারের এক ইউনিটের সালার সৈন্যসহ পিছপা হন। মূলত এ ছিল কৌশল। সুলতান মাহমুদ এই কৌশল বুঝতে না পেরে চাচাকে পরাস্ত করতে পেরেছে ভেবে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আর আগপর কিছু না ভেবে পিছপা হওয়া সেই ইউনিটের পশ্চাদ্ধাবন করে। ঠিক তখনই পেছনে সরতে থাকা ইউনিটের সেনারা কিছুটা ঘুরে গিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মাহমুদের বাহিনীর পশ্চাদভাগে হামলে পড়ে। সুলতান মাহমুদের এটা এক নির্বুদ্ধিতা ছিল যে, তিনি সানজারের যুদ্ধচাল এবং রণকৌশল বুঝতে পারেননি। তিনি এ-ও লক্ষ্য করেননি যে, বাহিনীর এক ইউনিট পেছনে হলে কী হবে, সানজার তো তাঁর পুরো বাহিনী এবং জঙ্গিহাতী নিয়ে ময়দানে শীসাঢালা প্রাচীর হয়ে আছেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সুলতান মাহমুদ এই আকস্মিক হামলার টাল সামলাতে না পেরে রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। তাঁর চাচা সানজার তাঁর বাহিনীর বড় বড় সালার এবং আমীরদের যুদ্ধবন্দি বানিয়ে নেন। সানজার কিছুদিন *রায়* শহরে অবস্থান করে *হামাদানের* দিকে অগ্রসর হন।

সানজারের বিজয়-সংবাদ বাগদাদ পৌঁছলে আব্বাসী খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ যখন অবগত হন যে, সানজার তাঁর ভাতিজা সুলতান মাহমুদকে পরাজিত করেছে—তখন বাগদাদেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কারণ ইতোপূর্বে বাগদাদে সুলতান মাহমুদের নামে খুতবা পড়া হত।

খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ মাহমুদের পরাজয়ের সংবাদ শুনে তাঁর নামে খুতবা মওকুফ করে সুলতান সানজারের নামে খুতবা পড়ার নির্দেশ জারি করেন।

অন্যদিকে চাচা সানজারের হাতে পরাজিত হওয়ার পর সুলতান মাহমুদ *ইস্পাহান* গিয়ে গা ঢাকা দেন। তাঁর সাথে তাঁর উজির এবং কতিপয় সালারও ছিল। ধীরে ধীরে পলায়নপর সৈন্যরাও সেখানে জমা হয়। তখন মাহমুদ একটি নতুন বাহিনী গঠন করেন। নতুন করে শক্তি অর্জন করে চাচার সঙ্গে আরেকবার মোকাবেলা করার ইচ্ছা করেন। সুলতান মাহমুদ যুদ্ধে লড়ার জন্য প্রচণ্ড উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু সালররা ছিল প্রচণ্ড ভীতসন্ত্রস্ত। তাই তারা সানজারের কাছে এই বলে বার্তা পাঠায় যে, আপনি যদি খোরাসান ফিরে যান তাহলে আপনার এবং সুলতান মাহমুদের মধ্যে সন্ধির রাস্তা খুলতে পারে। কিন্তু সানজার তাদের শর্ত অগ্রাহ্য করেন।

রায় শহর পদানত করার পর সুলতান সানজার সৈন্যসহ [১৩]*হামাদানের* দিকে অগ্রসর হন। এ সংবাদ সুলতান মাহমুদের কাছে পৌঁছুলে তাঁর কতিপয় হিতাকাঙ্খী এবং দরবারের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, এবার যদি তিনি তাঁর চাচার কাছে পরাজিত হন তখন আর

---

১৩. হামাদান পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি শহর। ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় পাহাড়ি শহর এটি। কালের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এ শহর। রাজধানী তেহরান থেকে ৩৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এর অবস্থান।

তাঁর আশ্রয় নেয়ার কোনো জায়গা থাকবে না। এরচেয়ে সন্ধি করে নিরাপদ থাকাই শ্রেয়। সুলতান মাহমুদ অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করতে পেরে সুলতান সানজারের কাছে এই শর্তে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান যে, সুলতান সানজার যেন তাকে (মাহমুদকে) নিজের উত্তরাধিকার নির্ধারণ করেন। সুলতান সানজার তাঁর এই শর্ত কবুল করে নেন। তারপর সুলতান মাহমুদ নিজে চাচার সাক্ষাতে তাঁর খেদমতে হাজির হন।

অবশ্য সুলতান মাহমুদের আগ বেড়ে দেয়া এ শর্তে সুলতান সানজার সন্ধি করতেন না। কারণ তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল, তিনি মাহমুদকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যের একক সুলতান হতে পারবেন। কিন্তু বাধ সাধে তাঁর মা সুলতান মাহমুদের দাদি। তিনি উভয়জনকে সন্ধি করার জন্য জোর করেন। সন্ধিচুক্তি কার্যকর হওয়ার পর সুলতান মাহমুদ সুলতান সানজারের কাছে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে হাজির হন। সুলতান সানজারও তাকে অগণিত উপহারে বরণ করে নেন। পাশাপাশি সুলতান সানজার আরেকটি কাজ করেন, দ্রুতগামী একজন দূত বাগদাদে খলিফা মুসতারশিদের উদ্দেশ্যে রওনা করান। আর খলিফার কাছে আবেদন করেন, বাগদাদে যেন তাঁর নিজের নামের সাথে সুলতান মাহমুদের নামেও খুতবা পাঠ করা হয়। এভাবেই চাচা-ভাতিজার মাঝে সমঝোতা হয়। আর সালতানাত রক্ষা পায় রক্তক্ষয়ী এক গৃহযুদ্ধের কবল থেকে।

সুলতান সানজার মাহমুদের যে অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছিলেন সেগুলো ফিরিয়ে দেন এবং সেখানে তার শাসন পূর্বের মতো বহাল রাখেন।

দুবাইস বিন সাদাকা

সুলতান সানজার এবং সুলতান মাহমুদের মাঝে সন্ধি হয়ে গেলও সমস্যা শেষ হয় না। অন্য দিকে দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সুলতান মাহমুদের আরো দুইজন ভাই ছিল। একজনের নাম মালিক মাসউদ আরেকজন কূরু। তারা উভয়জনই বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর ছিলেন।

পরিস্থিতি শান্তই ছিল। কিন্তু এক কুচক্রী মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যার নাম: [১৪]দুবাইস ইবনে সাদাকা।

সুলতান মাহমুদের ভাই মাসউদ আজারবাইজান এবং মসুলের গভর্নর ছিলেন। নীরব-শান্ত গোছের একজন মানুষ ছিলেন তিনি। কিন্তু দুবাইস ইবনে সাদাকা তাকে সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। সে *হিলা*

১৪. জন্ম: ৪৬৩ হিজরী মোতাবেক ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে। হিলা শহরে। মৃত্যু: ৫২৯ হিজরী মোতাবেক ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। রাষ্ট্রীয় পদবি: আমীর/শাসক। সময়: ৫১২-৫২৯ হি./ ১১১৯-১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দ। ইবনে খাল্লিকান তার ব্যাপারে বলেন, সে একজন দানশীল, সম্ভ্রান্ত মানুষ ছিল। সাহিত্যানুরাগী ছিল। খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর সময়ে ইরাকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসক ছিল। সুলতান মাহমুদ-এর সহযোগিতায় হিলা শহরের শাসনপদ লাভ করে। তবে পরবর্তীতে ক্ষমতার লোভে রাষ্ট্রের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। সুলতান মাসউদ তাকে হত্যা করেন কৌশলে। [আল বিদায়া; আল কামিল ফিত তারিখ]

(বাবিল) শহরের আমীর ছিল। লোকটা আদতে কুচক্রী এবং গাদ্দার কিসিমের ছিল।

সুলতান সানজার এবং মাহমুদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদন হওয়ায় সে ক্রুব্ধ ও হতাশ হয়। কারণ সে চাইত কোনো না কোনো আমীর যেন সবসময় একে অন্যের বিরুদ্ধে লেগে থাকে। আর সে এর ফায়েদা লুটতে পারে।

আর তাই সে তার সাথে আরো কিছু দায়িত্ব জ্ঞানহীন কুচক্রীকে নিয়ে মাসউদকে সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে এই বলে উসকে দেয়—'মাহমুদের চেয়ে বরং আপনিই যোগ্য।' তাই তার পরিবর্তে আপনিই সুলতান হওয়ার অধিক উপযুক্ত। বাগদাদে খুতবায় সুলতান সানজারের নামের সাথে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়াটাই উচিত; তার নয়।

যে সময় কুচক্রীরা মাসউদকে উত্তেজিত করছিল, তখন মাহমুদের বাহিনী সুলতান সানজারের হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মাসউদ জোটবেধে সুলতান মাহমুদের অধীন অঞ্চলে সৈন্যসমাবেশ ঘটায়। সুলতান মাহমুদ ভাইয়ের এহেন অপতৎপরতায় ব্যথিত হন। তবে কালক্ষেপণ না করে একটি বাহিনী নিয়ে *আস্তারাবাদ* নামক স্থানে তাঁর ভাই মাসউদের প্রতিরোধ করেন। এখানে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ বাধে। এই যুদ্ধে সুলতান মাহমুদ বিজয়

লাভ করেন। মাসউদ চরমভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে বাঁচে। আর তার বাহিনীর একটা বড় অংশ বন্দি হয়।

পরাজিত হয়ে মাসউদ যুদ্ধের ময়দান থেকে আঠার ক্রোশ দূরের একটি পাহাড়ি অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। এ সময়েই মাসউদ নিজের ভুল বুঝতে পারেন। নিজের ভাই সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটা যে মারাত্মক অন্যায় হয়েছে—এ অনুশোচনা তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাই সে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে ভাই সুলতান মাহমুদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

এর মধ্যে কুচক্রীমহল চক্রান্ত করে যাচ্ছিল। মাসউদ যখন সুলতান মাহমুদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন দুস্কৃতিকারী সে মহলটি তাকে পরামর্শ দিল 'আপনি মাহমুদের কাছে না গিয়ে দুবাইসের কাছে যান। কারণ ইতোমধ্যেই সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে *হিলা* শহরে গিয়ে একটি বাহিনী সংঘবদ্ধ করে ফেলেছে। সুতরাং তাঁর উচিৎ দুবাইসের সাথে মিলে সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আরেকবার ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া। তারা তাকে এ বলে আশ্বাস দেয় যে, এবার বিজয় আমাদেরই হবে।'

মাসউদ এবারও হয়ত তাদের ফাঁদেই পা দিতে যচ্ছিলেন; কিন্তু তার কতিপয় হিতৌষী এবং নিবেদিত বন্ধুরা তাকে বুঝায়—যা ঘটছে, সবই কুচক্রীদের চক্রান্তের ফল। তারা দুই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

করার জন্য এসব করছে। তাই আপনার উচিৎ ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন না জ্বালানো। মাসউদ তাদের পরামর্শ মেনে সোজা ভাইয়ের খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হন। সুলতান মাহমুদও বদান্যতার পরিচয় দেন। তিনি মাসউদকে রাজকীয় অভ্যর্থনায় বরণ করে নেন। সানন্দে তাকে বুকে জড়িয়ে নেন। তাঁর ললাটে চুম্বন করে তাকে সম্মানিত করেন। এবং তাঁর শাসিত অঞ্চলগুলোতে তাকে পুনঃবহাল করেন।

কুচক্রী দুবাইসের এ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সে হতাশ হয়ে পড়ে। তাছাড়া সুলতান মাহমুদ এবং মাসউদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে তার পিতাও নিহত হয়; যা তার জন্য বড় ধাক্কা ছিল। এসব কারণ তাকে যেন উম্মাদ করে তোলে। তাই সে চারদিকে হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে। শহরের পর শহর বিরান করেও তার হিংস্রতা থামছিল না।

খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ তাকে এমন ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড করতে নিষেধ করেন। কিন্তু নিষেধের তোয়াক্কা না করে সে লুটতরাজ চালিয়ে যেতে থাকে। তখন আব্বাসী [১৫]খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ দুবাইসের অপতৎপরতা জানিয়ে সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখেন। খলিফার পত্র পেয়ে সুলতান মাহমুদ দুবাইসের উদ্দেশ্যে এক চরমপত্র

১৫. যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন একজন বীর। বাগ্মীতায় তুখোড়। একজন আবেদ। তুমুল জনপ্রিয়। ৫২৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর তিন মাস। তাঁর খেলাফতকাল ছিল ১৭ বছর ৬মাস ২০ দিন।

পাঠান। তাকে সতর্ক করে এসব ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু এতেও কাজ হয়নি; বরং এবার সে বাহিনী নিয়ে এই বাহানায় বাগদাদ হামলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় যে, সে তার পিতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়। বাগদাদের উপকণ্ঠে পৌঁছে সে শিবির স্থাপন করে। এবং সেখান থেকে খলিফাকে হুমকি ধমকি দিতে থাকে।

এই সংবাদ শুনতে পেয়ে সুলতান মাহমুদ তৎক্ষণাৎ বাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। উদ্দেশ্য–দুবাইসকে তার ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের উচিৎ শিক্ষা দেয়া।

সুলতান মাহমুদের সেনা সমাবেশের কথা শুনতে পেয়ে সে বাগদাদ থেকে পিছু হটে। এরপর তার স্ত্রী এবং আরো কিছু লোককে মূল্যবান উপঢৌকনসামগ্রী দিয়ে সুলতান মাহমুদের কাছে সন্ধির আবেদন পাঠায়। কারণ সে ভালো করেই জানত সুলতান মাহমুদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবে না; বরং এতে তার ক্ষতিই হবে।

কুচক্রী এবং ফিতনাবাজ লোক ছিল। তাই সে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা আঁচ করতে পেরে কিছুটা দমে যাওয়ার ভান করে। এবং পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দেয়ার কৌশল অবলম্বন করে। আর যেহেতু সুলতান মাহমুদও প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষ, তাই সহজেই তাকে ক্ষমা করে দেন।

দুবাইসের ক্ষমাপ্রাপ্তির সংবাদ যখন আব্বাসী খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ জানতে পারেন, তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন। সাথে সাথে সুলতান মাহমুদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান যে, দুবাইসের সাথে যেন কোনোভাবেই সন্ধি না করা হয়। কারণ সে পিতা-হত্যার প্রতিশোধ নিতে বাগদাদ আক্রমণের দুঃসাহস দেখিয়েছে। ভবিষ্যতেও যে সে আবার এ দুঃসাহস দেখাবে না তার নিশ্চয়তা নাই। তাই তাকে তার অপরাধের জন্য হত্যা করা দরকার। যাতে সবার জন্য এটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

খলিফার বার্তা পেয়েই সুলতান মাহমুদ দুবাইসের ফিতনা-ফাসাদ চিরতরে মিটিয়ে দিতে বাহিনী পাঠান। সেই সময় দুবাইসের কাছেও বিশাল এক বাহিনী বিদ্যমান ছিল। অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। তবে সুলতান মাহমুদের বাহিনী দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হয়। এই বিজয়ের ফলে দুবাইসের মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাই সে খলিফার কাছে একটি বার্তা দিয়ে দূত প্রেরণ করে। এতে সে খলিফার উদ্দেশে লেখে–

'আমি বাগদাদের মহামান্য খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহর একান্ত অনুগত এবং নিবেদিত অনুসারী; যেমনি পূর্বেও তাঁর অনুগত এবং অনুসারী ছিলাম। কারণ আমার আনুগত্য যদি নিবেদিত না হত এবং আমি যদি বিদ্রোহের ইচ্ছা রাখতাম, তাহলে কয়েকদিন আগে যে বাহিনীকে পরাস্ত করে বিজয় লাভ করেছি; তারপরই বাগদাদের

উদ্দেশে এগিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি তা করিনি।'

সে খলিফাকে এ-ও জানায় যে, তিনি যদি উজির জালালউদ্দীনকে অপসারণ করেন, তাহলে সে খলিফার পূর্ণ অনুগত এবং বাধ্য থাকবে।

খলিফা তখন একান্ত অক্ষম ছিলেন। কারণ মাত্রই সে সুলতান মাহমুদের বাহিনীকে পরাজিত করে শক্তি বৃদ্ধি করেছে। আর তাই তিনি দুবাইসের শর্ত মঞ্জুর করে উজির জালালউদ্দীনকে অপসারণ করেন। এতে করে দুবাইসের দুঃসাহস এবং ধৃষ্টতা আরো বেড়ে যায়।

সুলতান মাহমুদ যখন জানতে পারেন যে, সে খলিফার সাথে এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করেছে, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ দুবাইসের ভাই মানসুরকে বন্দি করেন। তারপর উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে তার চোখ ঘেঁটে তাকে অন্ধ করে দেন।

দুবাইস তার ভাইয়ের এই পরিণামের কথা জানতে পেরে সরাসরি বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়ে বসে। এবং বাহিনী নিয়ে চারদিকে লুটতারাজ চালাতে থাকে। শহরের পর শহর এবং গ্রামের পর গ্রাম বিরান করে নির্মম পাশবিকতায় মেতে ওঠে। শান্তি ও নিরাপত্তার নাম-নিশানটুকুও যেন মুছে যায়।

যে সময় এই নির্মম পাশবিকতা ঘটে চলছিল, তখন ইমাদউদ্দীন আমীর বারসাকির সাথে কাজ করতেন। দুবাইস যখন প্রকাশ্যে বিদ্রোহের ঘোষণা দেয় এবং ওয়াসেত ও তার আশপাশের এলাকায় নির্মমতা শুরু করে, তখন সুলতান মাহমুদ আমীর বারসাকি এবং ইমাদউদ্দীনের প্রতি নির্দেশ পাঠান—তারা যেন দুবাইসকে থামায়। ওকে উচিৎ শিক্ষা দেয়। ইমাদউদ্দীন তখন না কোন অঞ্চলের সুলতান ছিলেন, না কোন অঞ্চলের শাসনকর্তা; বরং তিনি তখন সামান্য একজন গভর্নর। তাই অন্যান্য আমীরদের মতো তিনিও এ ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।

এদিকে দুবাইস খলিফাকে ভাইয়ের চোখ নষ্ট করার প্রতিশোধ হিসেবে খেলাফতের রাজধানী বাগদাদ লুট করার হুমকি-ধমকি দেয়। এতে খলিফা ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে আমীর বারসাকির সাহায্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং যে কোনো মূল্যে দুবাইসকে নির্মূল করার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে স্বয়ং খলিফা নিজেও আরেকটি বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাগদাদ থেকে বের হয়ে পড়েন।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, 'সেই সময় খলিফা মুসতারশিদ বিল্লাহ কালো পাগড়ি মাথায় বেধেছিলেন। পরিধান করেছিলেন কালো পোশাক। কাঁধে চাদর। হাতে ছিল ছড়ি। কোমরে বন্ধনি।'

এ অভিযানে খলিফার সাথে ছিলেন বরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং বড় বড় সালার। *এডেসা* নামক স্থানে তিনি ছাউনি ফেলেন। সেখানে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ খলিফার খেদমতে উপস্থিত হয়ে দুবাইসের বিরুদ্ধে খলিফার আনুগত্যের বাইয়াত নেয়।

ওদিকে কুচক্রী দুবাইসও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। আমীর বারসাকি বাহিনী নিয়ে খলিফার সঙ্গে যোগ দেন। তারপর যৌথ বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দুবাইসের বাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান নেয়।

উভয় বাহিনীর আদর্শিক তফাৎ এ থেকেও স্পষ্ট যে–দুবাইসের বাহিনীর সম্মুখে রমণী এবং হিজড়ারা বাদ্য বাজিয়ে নৃত্য করছিল। আর–মুসলিম বাহিনীর সম্মুখসারিতে হাফেজ ও ক্বারীগণ কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন।

অবশেষে উভয় বাহিনীর মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খলিফা কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধের বিশেষ সময়ের জন্য সেনাবাহিনীর একটা ইউনিটকে ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে পৌঁছে, ঠিক তখন খলিফার নির্দেশে ঘাঁটিতে লুকিয়ে থাকা বাহিনী তাকবীর দিতে দিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং দুবাইসের বাহিনীর ওপর হামলে পড়ে। অতর্কিত এ হামলার ধাক্কায় দুবাইসের বাহিনী নাকাল হয়ে পড়ে। এবং পরাজিত হয়ে বেঁচে

যাওয়া সৈন্যদের নিয়ে ময়দান ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়। খলিফার যৌথবাহিনী তাদের পিছু নেয়।

দুবাইস চেয়েছিল তার অধীন শহর ওয়াসেতে আশ্রয় নিতে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে শুনতে পায়, ওয়াসেতে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সৈন্যসহ তার অপেক্ষায় আছে। এ সংবাদ শুনে সে ওয়াসেতের পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে। কারণ সে ইমাদউদ্দীনের বীরত্ব এবং সাহসিকতা সম্পর্কে ভালো করেই অবগত ছিল। আর সে এটাও জানত যে, ইমাদউদ্দীনের সাথে টক্কর দেয়ার অর্থ মৃত্যু ডেকে আনা। তাই *ওয়াসেত* যাওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন আরব গোত্রের কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

আরবের এই গোত্রগুলো খলিফার অসন্তুষ্টি এবং সুলতান মাহমুদের ক্রোধ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দুবাইসের সহায়তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে বাহরাইনে গিয়ে সে আশ্রয় নেয়।

সে খুবই ধূর্ত, চাটুকার এবং কুচক্রী লোক ছিল। বাহরাইন অবস্থানকালে সে কিছু আরবগোত্রকে নিজের দলে টেনে নিতে সক্ষম হয়। এভাবে সে আরেক দফা বিশাল বাহিনী একত্রিত করে ফেলে। এরপর বাহিনী নিয়ে *বসরার* দিকে ধেয়ে যায়। *বসরার* গভর্নর দুবাইসের এ তৎপরতা সম্পর্কে একেবারেই বেখবর ছিল। আর এ সুযোগেরই অসৎ ব্যবহার করে সে। লুটেরা বাহিনী নিয়ে

বসরার উপর আকস্মিক হামলে পড়ে। এতে শহরের অভ্যন্তরে এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। যাতে খোদ বসরার গভর্নরও নিহত হন। *বসরা* শহরে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ইচ্ছেমতো শহরে লুটতারাজ চালায়।

এদিকে খলিফা যখন *বসরায়* দুবাইসের লুটতরাজের সংবাদ শুনেন, তখন তিনি ইমাদউদ্দীনের কাছে দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত পাঠান। তাকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি দুবাইসকে দমন করেন এবং শহরের ক্ষয়-ক্ষতি মেরামত করে শহরের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

এই নির্দেশ পাওয়া মাত্র ইমাদউদ্দীন তীব্রবেগে *বসরা*র দিকে ছুটে যান এবং দুবাইসের বাহিনীর ওপর হামলা করে তাদের পর্যুদস্ত করেন। তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ইমাদউদ্দীন দ্রুততার সাথে *বসরার* ওপর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শহরের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নির্মাণ ও মেরামতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাদউদ্দীনের সঙ্গে সে মোকাবেলায় যেতে চাইত না। কারণ সে ভালো করেই জানত, ইমাদউদ্দীনের সঙ্গে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার মানে মৃত্যু ত্বরান্বিত করা। তাই সে ইমাদউদ্দীনের হাতে পরাজিত হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে খ্রিষ্টানদের কাছে চলে যায়। সেখানেও চাটুকারিতা করে তাদের মন গলিয়ে সেনাসহায়তার আবেদন করে এবং সফলও হয়। ফলে আবারও সে এক বিশাল বাহিনী

নিয়ে আলেপ্পো অভিমুখে যাত্রা করে। খ্রিষ্টানদের সে এ বলে বোঝায় যে, আলেপ্পো বিজয় করে সে শহর তাদের হাতে তুলে দেবে।

তবে তা আর হয়নি। কারণ তখন আলেপ্পোয় মুসলমানদের এক শক্তিশালী বাহিনী বিদ্যমান ছিল। খ্রিষ্টানরা *আলেপ্পো* অবরোধ করলে, শহরে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনী জবাবি হামলা করে। এতে খ্রিষ্টানরা ভড়কে যায়। পরাজয় আসন্ন দেখে নিরাশ হয়ে দুবাইসের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়।

এতো কিছুর পরও অনুতপ্ত না হয়ে সে কূটচাল অব্যাহত রাখে। সব জায়গা থেকে নিরাশ ও বিফল হয়ে সে এবার সুলতান সানজারের ভাতিজা এবং সুলতান মাহমুদের আরেক ভাই মালিক তুফরুলের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মালিক তুফরুল তখন [১৬]*সামাররায়* অবস্থান করছিলেন। কারণ তিনি *সামাররা* এবং [১৭]*যানজানের* গভর্নর ছিলেন।

ধূর্ত স্বভাব আর মিষ্টি ভাষা তো তার আছেই! তাই সহজেই যে কাউকে সে কাবু করে ফেলতে পারত। এবারও এর ব্যতিক্রম হল না। সে মালিক তুফরুলের মগজ ধোলাই করে ফেলে। নিজের মতো তাকে গড়ে

---

১৬. ইরাকের একটি শহর।
১৭.বর্তমান ইরানের পশ্চিমাঞ্চলের একটি জেলা।

তোলে। ইরাক দখলের স্বপ্ন দেখায়। তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, সে তার সঙ্গ দিলে তাকে সে ইরাক দখল করে দিতে পারে। মালিক তুফরুল শুরু থেকেই দাবিসকে খুব খাতির-সম্মান করত এবং তাকে নিজের একান্ত সহযোগীও বানিয়েছিল। কিন্তু যখন সে মালিক তুফরুলকে বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করল, তখন তিনি লাভ-লোকসানের হিসেব কষা শুরু করেন। এতোবড় ঝুঁকি তো আর এমনি এমনি নেয়া যায় না! তবে চাটুকার দুবাইস তাকে এ-বলে নিশ্চয়তা দেয়—যে করেই হোক খেলাফতের কেন্দ্র-ইরাকের উপর তার কর্তৃত্ব সে প্রতিষ্ঠা করে দিবে। আর এতে করে তুফরুল সুলতান সুলতান বনে যাবে। বাগদাদের খুতবায়ও তার নাম উচ্চকিত হবে।

সেই সময়ে ইরাকের *তিকরিত* শহরের গভর্নর ছিল একজন ইরানী। কালবিলম্ব না করে তিনি মালিক তুফরুল এবং দুবাইসের ষড়যন্ত্রের কথা খলিফাকে অবগত করেন। খলিফা এই দুই বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করার জন্য যুদ্ধপ্রস্তুতির নির্দেশ দেন। প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খলিফা বাহিনীসহ *শামাসিয়া* নামক স্থানে অবস্থান নেন। তুফরুল যখন শুনতে পায় যে, তার মোকাবেলায় খোদ খলিফা ময়দানে নেমেছেন, তখন সে ভীত হয়ে [১৮]খোরাসানের দিকে রোখ

---

১৮. খোরাসান বলতে—বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, তুর্কমেনিস্তানের দক্ষিণের কিছু অঞ্চল; বর্তমান ইরানের আফগান-সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চল এবং পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তানের কাবায়েলি কিছু এলাকাসহ বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলকে বোঝায়। [পাকিস্তানি গবেষক ড. ইসরার আহমদ।]

করে। তার এই অগ্রযাত্রায় সেসব অঞ্চলজুড়ে বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম এবং অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। তুফরুলের বাহিনী সর্বত্র লুটতারাজ চালাতে চালাতে অগ্রসর হতে থাকে এবং *দালুকা* নামক স্থানে এসে ছাউনি গাড়ে।

এদিকে খলিফাও সসৈন্যে *দালুকার* দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। দুবাইস এবং তুফরুল খলিফার অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে *দালুকা* ছেড়ে *হারুনিয়া* চলে যায়। পরিবর্তিত অবস্থায় তারা উভয়ে মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, তুফরুল খলিফার বাহিনীর মোকাবেলা করবে। আর সেসময়ে দুবাইস বাহিনীর একটা অংশ নিয়ে বাগদাদের দিকে রোখ করবে এবং বাগদাদ দখল করে নেবে। কিন্তু কুদরতের কারিশমায় তাদের এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। কারণ একদিকে টানাবর্ষণ—যার কারণে পুরো বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় বাহিনী নিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সাথে মালিক তুফরুলও প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। অন্যদিকে বাগদাদমুখি দুবাইস ও তার বাহিনী ঝড়বৃষ্টির কারণে কোনো রকম হাঁচড়ে-পাঁচড়ে [১৯]*নাহরাওয়ান* পর্যন্ত পৌঁছে। ক্ষুধার তাড়নায় তার বাহিনী নিশ্চল ও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। বাহিনীতে ন্যূনতম খাবারও বিদ্যমান ছিল না।

ঘটনাক্রমে সেপথ দিয়ে বাগদাদ থেকে কিছু উট আসছিল। যেগুলো কাপড়, জিন ও খাবার-বস্তুসামগ্রী বহন

১৯. ইরাকের একটি অঞ্চল।

করছিল। এগুলো খলিফার বাহিনীর জন্যই বাগদাদ থেকে পাঠানো হয়েছিল। দুবাইসের জন্য এই বহরটি নেয়ামত হিসেবেই যেন ধরা দেয়। কালক্ষেপণ না করে বাহিনীসহ বহরের ওপর হামলা করে এবং উটসহ সব বস্তুসামগ্রী কব্জা করে নেয়।

তবে এতে করে খলিফার বাহিনীতে দ্রুততার সাথে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, 'দুবাইস বাগদাদ দখল করার জন্য সসৈন্যে বাগদাদের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে।'

এই সংবাদ শোনামাত্র খলিফা ক্ষিপ্রতার সাথে বাগদাদে ছুটে আসেন। কারণ, যে করেই হোক মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু—বাগদাদকে অবশ্যই সুরক্ষিত রাখতে হবে।

এদিকে কয়েক দিনের অভুক্ত দুবাইস-বাহিনী খাবারদাবার পেয়ে পেট ভরে খেয়েদেয়ে সুখনিদ্রায় তলিয়ে গিয়েছিল। আর তখনই খলিফা বাহিনী নিয়ে *নাহরাওয়ান* পৌঁছান। দুবাইসের বাহিনীর অবস্থা এমনিতেই নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল, তাই খলিফার অতর্কিত উপস্থিতি টের পেয়ে সে ভয় পেয়ে যায়। বাগদাদ আক্রমনের খায়েশ উবে যায় তার। ব্যর্থমনে বাহিনী নিয়ে তুফরুলের কাছে পালিয়ে বাঁচে।

এরপর দুজন পরামর্শ করে। নিজেদের এবং বাহিনীর সৈন্যদের জানমালের হেফাজত করতে হবে। কারণ

তারা বুঝতে পেরেছিল যে, খলিফা যেহেতু তাদের দমন করতে বাগদাদ থেকে বের হয়েছেন, তাহলে তাদের আর নিস্তার নেই। পাশাপাশি তারা এই ভয়ও করছিল, খলিফা তো এমনিতেই রাগে-ক্ষোভে ফুঁসে আছেন, এবার যদি সুলতান মাহমুদও ক্ষুব্ধ হয়ে আবার তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামেন—তাহলে তাদের আর নিস্তার নেই। জানের মায়াই ত্যাগ করতে হবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয়, নিজেদের এবং সৈন্যদের জানমাল হেফাজত করার জন্য সুলতান সানজারের শরণাপন্ন হবে। অতঃপর উভয়ে রাস্তায় লুটতারাজ চালাতে চালাতে খোরাসান অভিমুখে ছুটে চলে।

দুর্যোগের ঘনঘটা

গৃহযুদ্ধের অগ্নিলাভা টগবগ করছিল মুসলিম জাহানে। এই অগ্নিলাভা নির্বাপিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। মুসলিম জাহানের দুর্ভাগ্য চরম পর্যায়ে পৌঁছে। কারণ ঠিক তখনই খলিফা এবং বাগদাদের সেনাপ্রধানের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বিরোধ দেখা দেয়। আর এই বিরোধই একসময় শত্রুতার রূপ ধারণ করে। সেনাপ্রধান প্রাণভয়ে বাগদাদ থেকে পলায়ন করে [২০]*হামাদান* গিয়ে সুলতান মাহমুদের কাছে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় নেন।

---

২০. ইরাকের একটি অঞ্চল।

তদানীন্তন মুসলিম জাহানের অবস্থা ছিল, শুধু বাগদাদের উপর আব্বাসী খেলাফতের রাজত্ব চলত। কিন্তু এ ছাড়া বাকি শহর-নগর ও অঞ্চলের উপর রাজত্ব করছিল সেলজুকরা। সুলতান মাহমুদের দুই ভাই মালিক মাসউদ ও তুফরুল রাজত্ব করতেন *হামাদান* ও এর আশপাশের কিছু এলাকায়। আর খোরাসানসহ আরো কিছু অংশের শাসক ছিলেন তাদের চাচা [২১]সুলতান সানজার। এভাবে মুসলমানদের সুবিশাল সালতানাত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। আর এই অনৈক্যের কারণেই সাম্রাজ্য এবং সুলতানরা সার্বিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তার ওপর আবার গৃহযুদ্ধ লেগেই থাকত।

যাই হোক, বাগদাদের সেনাপ্রধান পলায়ন করে *হামাদান* এসে সুলতান মাহমুদের কাছে আশ্রয় নেন। আর খলিফার বিরুদ্ধে সুলতান মাহমুদের কান ভারী করতে থাকেন। সুলতানকে এই বলে খলিফার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন যে, 'খলিফা দিনদিন সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করেই যাচ্ছেন। কারণ আপনার প্রভাব ও ক্ষমতাকে খলিফা নিজের জন্য কাঁটা মনে করেন। তা ছাড়া আবার বাগদাদের

---

২১. একজন দানবীর ও প্রভাবশালী শাসক ছিলেন। তাঁর আরবী নাম: আবুল হারিস। জন্ম: ৪৭৯ হিজরীতে। তাঁর ভাই সুলতান বারকিয়ারোকের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইবনে খাল্লিকান বলেন, সুলতান সানজার একজন সাহসী শাসক ছিলেন। দানবীর ছিলেন। একবার তিনি লাগাতার পাঁচ দিন শুধু দান করেন। হিসেব করে দেখা গেছে সেসময় তিনি ছয় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেছেন। মৃত্যু: ৫৫২ হিজরীতে। [সিয়ারু আলামিন নুবালা: খ:১৫; পৃ: ১৩৬]

খুতবায়ও আপনার নাম পাঠ করা হয়—যা খলিফা বরদাশত করতে পারেন না। তাই দিনদিন সেনাসংখ্যা বাড়াচ্ছেন। যাতে সুযোগ বুঝে আপনার উপর হামলা করে আপনার রাজ্য দখল করতে পারেন।

সুলতান মাহমুদ তার কথায় প্ররোচিত হন। আর কালক্ষেপণ না করে সেনাবাহিনী নিয়ে বাগদাদ অভিমুখে রওয়ানা হন। সুলতান বাগদাদের সন্নিকটে পৌঁছুলে, খলিফা তাঁর আগমনের হেতু জানতে পেরে তাঁর কাছে দূতমারফত বার্তা প্রেরণ করেন—

'দুবাইসের লাগাতার ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের কারণে এমনিতেই দেশের পরিস্থিতি বিগড়ে আছে। চারদিকে অশান্তি বিরাজ করছে। তদুপরি তুমি আবার নতুন করে যুদ্ধ বাঁধাতে এসেছো? নতুন করে পরিস্থিতি অশান্ত না করে তুমি বরং তোমার অঞ্চলে ফিরে যাও। তবে হাঁ, তোমার কোনোরকম অর্থ-সহযোগিতার প্রয়োজন থাকলে বলতে পার, আমি তার ব্যবস্থা করব।'

খলিফার এই বার্তা পেয়ে সুলতান মাহমুদের সন্দেহ এবং আশঙ্কা আরো বেড়ে যায়। ফলে তিনি বাগদাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

এদিকে খলিফা সুলতান মাহমুদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাজপ্রসাদ ছেড়ে বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে এই ঘোষণা করে চলে যান—

'যদি সুলতান মাহমুদ আর সামান্যও সামনে অগ্রসর হয়, তাহলে তিনি বাগদাদ ছেড়েই চলে যাবেন। আর এর কারণে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে, তার দায়ভার বর্তাবে সুলতান মাহমুদের ওপর।'

পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে যাচ্ছে দেখে সুলতান মাহমুদ খলিফার কাছে শহরে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানান। কিন্তু খলিফা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

এতে সুলতান মাহমুদ অগ্নিশর্মা হয়ে বাগদাদের দিকে আরো অগ্রসর হতে থাকেন। খলিফা তখনো পশ্চিমাঞ্চলেই অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে তিনি তাঁর সালার আফিফের নেতৃত্বে একটি বাহিনী সুলতান মাহমুদের মোকাবেলায় পাঠান।

আফিফ ছিল অমিততেজি এক বীরপুরুষ। কিন্তু মুসলমানদের এই গৃহযুদ্ধে অনেকের মতো সেও অংশ নিতে চাচ্ছিল না। তবে যেহেতু খলিফার নির্দেশ, তাই সে বাহিনী নিয়ে সুলতান মাহমুদের মোকাবেলায় এগিয়ে যায়। সুলতান মাহমুদ অগ্রসরমান বাহিনীর কথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ দূত পাঠিয়ে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীকে সাহায্যের জন্য তলব করেন।

সুলতান মাহমুদের ডাকে ইমাদউদ্দীন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাহিনী নিয়ে আসতে বাধ্য হন। কারণ ইমাদউদ্দীনের অধীন অঞ্চলগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান ছিল এমন

যে, যদি তিনি অস্বীকৃতি জানাতেন তাহলে নিজেদের লোকদেরই দুশমনে পরিণত হয়ে যেতেন এবং তাঁর শাসিত অঞ্চলও হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল। তাই তিনি কালবিলম্ব না করে বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন এবং সুলতান মাহমুদের নির্দেশে সেনাপতি আফিফের বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে এক ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলাফল–ইমাদউদ্দীনের হাতে আফিফের পরাজয় এবং রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন।

আফিফ পরাজিত হয়ে খলিফার কাছে ফিরে আসে। পরাজয়ের সংবাদ শুনে খলিফা দ্রুত বাগদাদে প্রবেশ করে শহরের সকল ফটক বন্ধ করে দেন। এর ফলে বাগদাদের অধিবাসীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হাজারো কণ্ঠে শ্লোগান ওঠে–মুসলমানরা পরস্পর লড়ছে কেন?

অন্যদিকে ইমাদউদ্দীনের কাছে সালার আফিফের পরাজিত হওয়াতে খলিফা খুবই মর্মাহত হন এবং এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করেন।

অল্প সময়ের মধ্যে খলিফা বাহিনী তৈরী করে ফেলেন। *দজলা (টাইগ্রিস)* নদীর উপর পুল বানানোর নির্দেশ দেন। এরপর *দজলা* অতিক্রম করে সৈন্যবহর নিয়ে আগে বাড়তে থাকেন।

অন্যদিকে ইমাদউদ্দীন সুলতান মাহমুদের তলবে বাহিনী নিয়ে এলেও তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না যে, মুসলিম শক্তিগুলো ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই এই উত্তপ্ত প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ বন্ধের জন্য তিনি উত্তম একটি পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি নিজের বাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করে জল এবং স্থলভাগ অবরোধ করে ফেলেন। এর ফলে তাঁর বাহিনী খলিফা এবং সুলতান মাহমুদের বাহিনীর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এতে ইসলামি সালতানাত রক্তক্ষয়ী এক গৃহযুদ্ধের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়। ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর কৌশল দেখে খলিফা এবং সুলতান মাহমুদ উভয়েরই যেন হুঁশ ফিরে আসে। পরবর্তীতে ইমাদউদ্দীনসহ কতিপয় সালারের উদ্যোগে খলিফা এবং সুলতান মাহমুদের মাঝে সন্ধি স্থাপিত হয়। এরপর সুলতান মাহমুদ নিজ সেনাবাহিনী নিয়ে *হামাদান* ফিরে আসেন। তবে ইমাদউদ্দীন সুলতান মাহমুদের সাহায্যে ছুটে আসায় খলিফা তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন?

অপরদিকে দুবাইসের মতো ধূর্ত, সুবিধাবাদী ব্যক্তিও বসে ছিল না। সে যখন দেখল, সুলতান সানজারকে সে চাটুকারিতায় প্রভাবিত করতে পারছে না, ওদিকে খলিফা এবং সুলতান মাহমুদের মধ্যে সন্ধিও হয়ে গেছে। তখন সে সুলতান মাহমুদের কাছে ছুটে এসে বিনয়াবনত হয়ে আবেদন করে, যেন তিনি খলিফার কাছ থেকে তার ক্ষমার পরোয়ানা নিয়ে দেন এবং তাকে কোনো শহরের গভর্নর নিযুক্ত করিয়ে দেন।

সুলতান মাহমুদ তাকে নিয়ে খলিফার উদ্দেশে রওয়ানা হন। খলিফার দরবারে উপস্থিত হয়ে খলিফার কাছে আবেদন করেন—খলিফা যেন তার পূর্বের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেন।

দুবাইস ইতোপূর্বে *হিলা* শহরের গভর্নর ছিল। যখন সে খলিফার দরবারে হাজির হল, তখন খলিফা তার উপস্থিতিতেই সুলতান মাহমুদকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তাকে ক্ষমা তো করে দিতে পারি; কিন্তু তাকে *হিলা*র পরিবর্তে অন্য কোনো শহরের গভর্নর নিযুক্ত করা হবে।

এবারও দুবাইস কূটচাল চেলে তার কর্ম সম্পাদন করার চেষ্টা চালায়। সে সুলতান মাহমুদের সামনে [২২]এক হাজারের চেয়ে বেশি দিনার পেশ করে বলে, 'এটা আমার পক্ষ থেকে সুলতানের জন্য সামান্য উপঢৌকন। এর বিনিময়ে আপনি আমাকে মসুলের গভর্নর বানিয়ে দিন।'

মসুলের শাসক ছিলেন তখন ইমাদউদ্দীন। তিনি এই কূটচালের কথা জানতে পেরে, তৎক্ষণাৎ সুলতান মাহমুদের সঙ্গে মিলিত হন। ইমাদউদ্দীনের এই সাক্ষাতের ফলে দুবাইসের সবধরনের কূটচাল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

---

২২. ১ দিনার সমান = ১৫,৩৩১ টাকা। তাহলে ১ হাজার দিনার সমান = ১,৫৩,৩১,০০০ টাকা।

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুপরবর্তী দৃশ্যপট

তাকদিরের লিখন, যায় কি খণ্ডন? সুলতান মাহমুদ হামাদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সঙ্গে ছিল দুবাইস। *হামাদান* পৌঁছে সুলতান মাহমুদ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেই অসুস্থতায়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর মৃত্যুর পর দুবাইস আবারও খোলস ছেড়ে স্বরূপে আবির্ভূত হয়। সে আবারও সুলতান সানজারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। তাকে এই বলে প্ররোচিত করে যে, তাঁর ভাতিজা মাহমুদের মৃত্যুর পর এখন মাহমুদের শাসিত অঞ্চলগুলোতে শাসন করার অধিকার একমাত্র সুলতান সানজারের।

এদিকে সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর হামাদানের সিংহাসনে তাঁর পুত্র সুলতান দাউদ সমাসীন হন।

পরিস্থিতি আবারও অশান্ত হয়ে যায়। কারণ সুলতান দাউদের ভাইয়েরা তার শাসিত অঞ্চলগুলো দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ছিল মালিক মাসউদ। মালিক মাসউদ সুলতান মাহমুদের পুত্র সুলতান দাউদ-শাসিত অঞ্চলগুলোর উপর আক্রমণ করে বসে। তখন সুলতান দাউদ তার ভাই সালজুককে মোকাবেলার জন্য পাঠান। দুই ভাই মিলে খলিফাকেও নিজেদের পক্ষে নিয়ে নেন।

মালিক মাসউদ যখন দেখলো যে, খলিফাও তার বিরুদ্ধে। আবার দাউদ এবং সালজুক মিলে তার বিরুদ্ধে বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করেছে। তাই সে ইমাদউদ্দীনকে তার দলভুক্ত করে নেয়।

ইমাদউদ্দীনকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই এই গৃহযুদ্ধে জড়াতে হয়। কারণ তার চারপাশেই এই গৃহযুদ্ধগুলো সংঘটিত হওয়ায় তিনিও এতে জড়িয়ে পড়ছিলেন। অন্যথায় তাকে মসুলের শাসনও হারাতে হত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ইমাদউদ্দীন সেনাবাহিনী নিয়ে বের হন।

দজলা নদীর তীরে ভয়াবহ এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মালিক মাসউদ পরাজিত হন। ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী যেহেতু বাধ্য হয়ে মালিক মাসউদকে সাহায্যের জন্য এসেছেন, তাই পরাজয় নিশ্চিত দেখে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী বাহিনী নিয়ে মসুলে পিছিয়ে আসতে থাকেন। কিন্তু খলিফা এবং সালজুকের বাহিনীর একটি ইউনিট তাদের পিছু নেয়।

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী যখন *তিকরিত* শহরের কাছাকাছি আসেন, তখন তিকরিতের গভর্নর সালাহউদ্দীন আইউবীর পিতা নাজমউদ্দীন আইউবী নদী পারপারের জন্য ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীকে নৌকা সরবরাহ করেন। এ কথা জানতে পেরে নাজমউদ্দীনকে খলিফা তিকরিতের শাসনপদ থেকে বরখাস্ত করেন। বরখাস্ত হয়ে নাজমউদ্দীন মসুলে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর কাছে চলে যান। ইমাদউদ্দীন

তাকে যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন। যোগ্য পদে নিয়োগ করেন। যা পরবর্তীতে তার নিজের, তাঁর ভাই শেরকোহের এবং তাঁর পুত্র সালাহউদ্দীন আইউবীর উজ্বল ভবিষ্যতের ভিত রচনা করেতে কার্যকরি ভূমিকা রাখে।

সেলজুক শাহজাদাদের এই গৃহযুদ্ধ মুসলিম জাহানের পরিস্থিতি একেবারে অশান্ত এবং বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিল। প্রত্যেকেই অন্যের শাসিত অঞ্চল দখল করাকে নিজের অধিকার মনে করত। সেলজুক শাসকদের মধ্যে অভিজ্ঞ, প্রবীণ ও প্রভাবশালী একমাত্র সুলতান সানজারই তখন জীবিত ছিলেন। তাছাড়া বাকি শাসকরা প্রায় সবাই ছিল তাঁর ভাতিজা।

সুলতান সানজার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গড়া এক মহানহৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি কখনোই চাইতেন না যে, মুসলিম জাহান গৃহযুদ্ধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে নিজেদের শক্তি ও প্রভাব নিঃশেষ করে ফেলুক।

তাই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি উদ্যোগী হয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে খোরাসান থেকে বের হন। উদ্দেশ্য—গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থিতি ফিরিয়ে আনা।

ঠিক তখনই খলিফা মুসতারশিদবিল্লাহ আরেক অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। যেহেতু এক যুদ্ধে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর হাতে তিনি লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হন, তাই ইমাদউদ্দীনের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য

এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মসুল অভিমুখে রওয়ানা দেন। ইমাদউদ্দীনের গোয়েন্দাবাহিনী ছিল অত্যন্ত চৌকস ও তৎপর। তারা দ্রুততার সাথে তাকে পুরো ব্যাপার অবহিত করেন। তারা জানান যে, আপনার চেয়ে কয়েকগুণ বড় বাহিনী নিয়ে খলিফা আক্রমণের উদ্দেশ্যে মসুলের দিকে ছুটে আসছেন।

এ সংবাদ ইমাদউদ্দীনকে বেচাইন এবং অস্থির করে তোলে। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইয়ের এ আত্মহনন থেকে তিনি এড়িয়ে চলতে চাইলেও, পরিস্থিতির কারণে বারবার তাতে ফেঁসে যেতেন। ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সবসময় চাইতেন, মুসলমানদের যেসব অঞ্চল খ্রিষ্টানরা দখল করে নিয়েছে সেগুলো পুনরুদ্ধার করবেন। বাড়বাড়ন্ত ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত পদক্ষেপে এগোবেন। কিন্তু মুসলিম শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কলহের কারণে তাঁর সেই স্বপ্ন আপাত অধরাই থেকে যায়।

খলিফার এ অবিবেচক তৎপরতা মোকাবেলায় ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। বাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করে একাংশকে চৌকশ সালার নাসিরউদ্দীনের অধীনে দিয়ে তাকে শহরের অভ্যন্তরে নিযুক্ত করেন। তাকে নির্দেশ দেন যে, খলিফা যদি শহরে আক্রমণ করে বসে, তখন সে যেন শহরের অভ্যন্তরে থেকেই তাঁর প্রতিরোধ করে। আর সেনাবাহিনীর বাকি অংশ নিয়ে তিনি শহর থেকে বেরিয়ে যাবেন এবং

বাইরে থেকেই খলিফার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করবেন। রাতের আঁধারে চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে তাকে বাগদাদ ফিরে যেতে বাধ্য করবেন।

ইমাদউদ্দীনের ভাগ্য ভালো যে, ঠিক সেই সময়ই সুলতান সানজারও বাহিনী নিয়ে বের হয়েছিলেন। ইমাদউদ্দীন তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সুলতান সানজারের কাছে চলে যান এবং তাকে বিস্তারিতভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। ইতোমধ্যে খলিফা নিজ বাহিনী নিয়ে মসুল অবরোধ করে ফেলেন।

খলিফার এই অবিবেচক কর্মকাণ্ড সুলতান সানজারের মোটেও পছন্দ হয়নি। তিনি সরাসরি খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হলেও, ইমাদউদ্দীনকে তিনি সার্বিক সহযোগিতা করেন। যার ফলে ইমাদউদ্দীন বাইরে থেকে আক্রমণ করে খলিফার পুরো বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলতে সক্ষম হন। সুলতান সানজারের পরামর্শে ইমাদউদ্দীন সম্পূর্ণভাবে খলিফার বাহিনীকে অবরোধ করে ফেলেন। ফল এই হয় যে—বাগদাদের সাথে খলিফার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর কাছে রসদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসা বন্ধ হয়ে যায়। এতে খলিফার বাহিনী কেবল রসদসঙ্কটেই পতিত হয়নি; বরং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্যেও বাহিনীতে হাহাকার পড়ে যায়।

পরিস্থিতি সম্পূর্ণ খলিফার প্রতিকূলে চলে যায়। এ অবস্থা তাকে অস্থির করে তোলে। ইমাদউদ্দীন ইচ্ছা করলেই তখন রাতের আঁধারে গেরিলা ও চোরাগুপ্তা হামলা করে খলিফার বাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ এতে নির্দোষ ও নিরপরাধ মুসলমানদের রক্ত ঝরবে?

তাঁর উদ্দেশ্য একটাই—যেভাবেই হোক খলিফার বাহিনীকে বাগদাদ ফিরে যেতে বাধ্য করা। কাঙ্খিত উদ্দেশ্য অর্জনে তিনি সফল হন। কারণ, খলিফার বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখার কারণে তাঁর সেনাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন খলিফা পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে মসুলের অবরোধ তুলে নিয়ে বাগদাদে ফিরে যান।

এই ছিল তদানীন্তন মুসলিম জাহানের অবস্থা। আর এ গৃহযুদ্ধের কারণেই *আছারিব* এবং *হারিম* বিজয়ের পর দশ বছর পর্যন্ত ইমাদউদ্দীন মুসলিম জাহানের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে ছিলেন। দশ বছরের গৃহযুদ্ধে তাঁর বাহিনী অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। খলিফা অবরোধ ভেঙে বাগদাদ ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আপাতত গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে। এতে সুলতান সানজারও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, বাহিনী নিয়ে খোরাসান প্রত্যাবর্তন করেন। আর ইমাদউদ্দীন মসুল ফিরে এসে যুদ্ধপ্রস্তুতিতে পরিপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। সেনাসংখ্যা বাড়ানোর জন্য সেনাভর্তি

বেগবান করেন। আর গৃহযুদ্ধের অবসান হওয়ায় তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ফের লড়াই করার প্রতিজ্ঞা করেন।

ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নবডংকা

৫২৪ হিজরীতে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী ক্রুসেডারদের কবল থেকে *আছারিব* শহর পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এর পরপরই তিনি *হারিম* বিজয় করেন। *হারিম* বিজয়ের পর দীর্ঘ দশ বছর গৃহযুদ্ধে ফেঁসে সবকিছু স্থবির হয়ে পড়ে। এই দশ বছর তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেয়ার সুযোগও পাননি। এভাবে ৫২৪ হিজরী থেকে ৫৩৪ হিজরী পর্যন্ত চলা গৃহযুদ্ধ—মুসলিম জাহানকে একেবারে দুর্বল করে ফেলে।

গৃহযুদ্ধে জর্জরিত মুসলিম জাহান এবং সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা ক্রুসেডের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। গৃহযুদ্ধ শেষ হতেই ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী আর কালক্ষেপণ করেননি। তিনিও নতুনভাবে শুরু করেন যুদ্ধপ্রস্তুতি। কারণ তাঁর লক্ষ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। ক্রুসেডারদের কবল থেকে মুসলিম ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করাই যে ছিল তাঁর ভিশন।

গৃহযুদ্ধের অবসান হতে না হতেই ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা ক্রুসেডের ঘোষণা করে বসে। এ ঘোষণার দুইটি কারণ উল্লেখ করে তারা।

প্রথমত, ইমাদউদ্দীন তাদের দুটি শহর—আছারিব এবং হারিম দখল করে নেন। অথচ *আছারিব* এবং *হারিম* ছিল তাদের শক্তিশালী দুর্গ। আর তাই সেগুলো হাতছাড়া হওয়াতে তারা একেবারে মুষড়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয়ান ক্রুসেডাররা দেখল যে, মুসলমানরা গৃহযুদ্ধ জর্জরিত। এক আমীর আরেক আমীরের ওপর হামলা প্রতিহামলায় ব্যস্ত। আর টানা যুদ্ধে মুসলিম আমীররা যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে; বাগদাদের খেলাফতও নড়বড়ে হয়ে আছে। তো এই সুযোগে অকস্মাৎ মুসলিম জাহানের ওপর হামলা করে কিছু ভূমি তো করায়ত্ত করা যাবে!

এসব বিষয় সামনে রেখে রোম এবং ফ্রান্সের সম্রাটদ্বয় সিদ্ধান্ত নেয়, তারা নিজেরাই নেতৃত্ব দিয়ে সসৈন্যে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর ওপর হামলে পড়বে এবং নবউদ্যমে ক্রুসেডের সূচনা করবে।

রোমসম্রাট এবং ফ্রান্সের রাজার সম্মিলিত বাহিনী মুসলিম ভূখণ্ডের দিকে মার্চ করে। তাদের সর্বপ্রথম শিকারে পরিণত হয় [২৩]*বাজা* নগরী। তারা সর্বশক্তি নিয়ে বাজার ওপর আক্রমন করে। *বাজায়* তেমন কোন সেনা ইউনিট ছিলো না, যা তাদের প্রতিরোধে সক্ষম হবে। তাই ক্রুসেডাররা খুব সহজেই *বাজা* নগরী দখল করে নেয়।

---

২৩. সিরিয়ার একটি এলাকা।

শহরের পুরুষদের তারা গণহারে হত্যা করে এবং নারী শিশুদের দাস-দাসী বানিয়ে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যায়।

বাজা নগরীর বিজয় অনায়সে হয়ে যাওয়াতে ক্রুসেডাররা আরো সাহসী এবং বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তারা মনে করে, মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ গৃহযুদ্ধের কারণে আসলেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের পরাজিত করে ভূমি দখল করে নেয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

বাজা বিজয়ের পর ক্রুসেডাররা আগে বাড়তে থাকে। ১৭ ই শাবান ৫৩৪ হিজরী সনে তারা মুসলমানদের আরো একটি শহর অবরোধ করে। যার নাম ছিল *শিজার*।

আবু আসাকির নামক এক ব্যক্তি তখন এ শহরের গভর্নর। একজন সাহসীযোদ্ধা এবং জোয়ান ব্যক্তি তিনি। ইসলামের প্রতি তাঁর ভালোবাসাও ছিল প্রবল। আপাদমস্তক দীনি জযবায় উজ্জীবিত এক মর্দে মুজাহিদ। তিনি সংকল্প করেন, ইউরোপীয় ক্রুসেডাররা *বাজা* নগরী দখল করলেও তাদের কখনো *শিজার* দখল করতে দেবেন না।

ক্রুসেডারদের *শিজার* নগরীর দিকে এগিয়ে আসার খবর শোনামাত্র আবু আসাকির একজন দূতকে দ্রুততার সাথে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর কাছে প্রেরণ করে জরুরি সেনাসাহায্যের আবেদন করেন।

শিজারের গভর্নর ক্রুসেডারদের *বাজা* দখলের কারণেও অত্যন্ত মর্মাহত হন।

প্রসিদ্ধ পর্যটক ইবনে জাবির লেখেন, *বাজা* ছিল অনেক বড় এক নগরী। যার দূর্গও ছিল খুব মজবুত এবং দুর্ভেদ্য। এখানে পানির ফোঁয়ারা ছিল। চারপাশে নানান কিসিমের ফল-ফুলের বেশুমার বাগান ছিল। এই শহরটি যে অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, তাকে *ওয়াদিয়ে বাতনান* বা বাতনান অঞ্চল বলা হত। এখানে এক বিশেষধরনের সুতির কাপড় তৈরি হত, যা মিসর এবং দামেশকে রপ্তানি করা হত। এই সুতি কাপড় তখন *কারপাস* নামে প্রসিদ্ধ ছিল। অভিজাত মহলে এই কাপড়ের খুব কদর ছিল।

ঐতিহাসিক আবুল ফিদা লেখেন, *বাজা* শহরে আকিল ইবনে আবু তালিব রাযি.-এর সমাধি রয়েছে। শহরটির অবস্থান আলেপ্পো থেকে একদিনের দূরত্বে।

যাই হোক, রোমসম্রাট এবং ফ্রান্সের রাজা যখন *শিজার* শহরের উপকণ্ঠে সেনাসমাবেশ ঘটায়, তখন শিরাজের শাসকের দূত নিঃশব্দে ছুটে চলেছেন ইমাদউদ্দীনের কাছে সাহায্যবার্তা নিয়ে। যত দ্রুত সম্ভব তাকে পৌঁছুতে হবে জেঙ্গীর কাছে। পাশাপাশি তিনি দূর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করেন। ক্রুসেডাররা নগরপ্রাচীরের কাছে ঘেঁষতে চাইলেই দূর্গের পাঁচিলে অবস্থানরত বাহিনী তাদের ওপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করত। উত্তপ্ত গরম পানি ছুড়ে মারত।

আগুনের অঙ্গার নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিত। শিরাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বেসামরিক জনসাধারণও প্রাচীরের উপর অবস্থান নিয়ে ক্রুসেডারদের প্রতিহত করতে থাকেন। কেউ পানি গরম করছে, কেউ আবার আগুনের অঙ্গার প্রস্তুত করছে—এভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করতে থাকে।

এদিকে দূত দ্রুততার সাথেই ইমাদউদ্দীনের কাছে পৌঁছে যায়। ইমাদউদ্দীন তখন সবেমাত্র গৃহযুদ্ধ থেকে হাত ঝেড়ে বাহিনী গোছানোয় মন দিয়েছেন। আবু আসাকিরের দূত ইমাদউদ্দীনকে জানায়, 'রোমসম্রাট এবং ফ্রান্সের রাজার যৌথ বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ করে সীমান্তবর্তী *বাজা* নগরী দখল করে নিয়েছে। আর এখন *শিজার* অবরোধ করে রেখেছে।'

ইমাদউদ্দীন এই সংবাদ শুনে অস্থির হয়ে পড়েন। দূতের অবস্থাও ছিল করুণ। একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ তিনি। অবিশ্রান্ত দ্রুত সফরের কারণে তার পাগড়ি এবং শ্মশ্রুতে ধুলোবালি দলা পাঁকিয়ে আছে। আর যখন তিনি *বাজা* নগরীর মর্মন্তুদ দাস্তান এবং *শিজার* অবরোধের কথা সবিস্তারে শুনাচ্ছিলেন, তখন তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তার ধুলোমলিন শ্মশ্রু ভিজে একেবারে জবজবে অবস্থা।

এই দৃশ্য ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর বরদাশত করার ক্ষমতা ছিল না। দূত যখন *বাজার* মর্মন্তুদ দাস্তান এবং *শিজার* অবরোধের কথা শোনাল, তখন তিনি বলে উঠলেন,

'প্রিয়! আমি জানি, লাগাতার সফরের কারণে আপনি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। আপনি পরিস্থিতির যে বর্ণনা দিয়েছেন–তাতে আমি দেরি করাটা মুনাসিব মনে করছি না। আমি আজই শিজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাব। আর আপনি এখানে কয়েকদিন বিশ্রামে থেকে, পরে শিরাজে ফিরে যাবেন।'

ইমাদউদ্দীনের এই কথা শুনে বার্তাবাহকের চেহারায় আনন্দ এবং প্রশান্তির আভা ফুটে ওঠে। যেখানে কিছুক্ষণ পূর্বেও তার চোখ ছিল অশ্রুসজল, সেখানে এখন ফুটে ওঠেছে আনন্দের ঝিলিক। ঠোঁটে তার মুচকি হাসি। তিনি ইমাদউদ্দীনের উদ্দেশে বলে উঠেন,

'মুসলিম জাহানের দরদি ও মুরুব্বি সুলতান! আপনার বলা কথাগুলো শুনে, আল্লাহর কসম–আমার যত ক্লান্তি-শ্রান্তি সব দূর হয়ে গেছে। এখন আমি একদম তাজাদম হয়ে গেছি এবং আপনার বাহিনীর সাথেই সফর করতে পারব। তাছাড়া আমি চাই, আপনি আমাকে কোনো পয়গাম দিন, আমি আপনার বাহিনীর আগে রওয়ানা হয়ে সেই পয়গাম সুসংবাদ হিসেবে আবু আসাকিরকে শোনাবো। এতে তার মনোবল চাঙ্গা হবে।

ইমাদউদ্দীন তার কথা শুনে ভীষণ খুশি হন এবং বলেন, আচ্ছা, তাহলে আপনি আমার আগেই আবু আসাকিরের কাছে পৌঁছে যান। আর তাকে আমার পক্ষ থেকে বলবেন যে, সে এতদিন যাবত ক্রুসেডারদের শক্তভাবে প্রতিরোধ করে এসেছে, তো আর কিছু সময়ও যেন সে বুক চিতিয়ে তাদের প্রতিহত করে। আল্লাহ পাক চাইলে আগামী রাতেই আমি শজারের আশেপাশে থাকব। তাকে বলবেন, আগামী কাল রাতে যেন শহরের চারপাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। রাতে আমরা আকাশের দিকে জ্বলন্ত তীর নিক্ষেপ করব। এটা আমার *শিজার* পৌঁছার নিদর্শন। আমি *শিজার* পৌঁছেই ক্রুসেডারদের ওপর হামলা করব। তখন আবু আসাকিরও যেন শহর থেকে বেরিয়ে তাদের ওপর হামলা করে। দুতরফা হামলায় ক্রুসেডারদের কী অবস্থা হয় পৃথিবী তা দেখবে।

ইমাদউদ্দীনের এই কথা শুনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। দেরি না করে শিজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। *শিজার* পৌঁছে তিনি আবু আসাকিরকে ইমাদউদ্দীনের পয়গাম শুনান। এ পয়গাম পেয়ে তাদের জোশ যেন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তারা পূর্বের চেয়ে আরো ক্ষিপ্রতার সাথে আক্রমণ করতে থাকেন।

শিজার উপকণ্ঠে জেঙ্গীর রণকৌশল

কৃষ্ণপক্ষের সে রাতটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। ক্রুসেডাররা রাতের আঁধারেও থেমে থেমে নগরপ্রাচীরে হামলা চালাচ্ছিল। আবু আসাকির তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই প্রতিরোধ করে যাচ্ছিলেন।

শিজার শহরে মুসলমানদের প্রসিদ্ধ একটি দূর্গ ছিল। *আসী* নদীর তীরে ছিল শহরটির অবস্থান। ঐতিহাসিক আবুল ফিদা লেখেন,

[২৪]*শিজার* অত্যন্ত মজবুত এবং দুর্ভেদ্য একটি দূর্গ। এর উত্তর-দিকে বয়ে গেছে [২৫]*আসী* নদী। সামান্য দূরত্বেই এক উঁচু বাঁধ থেকে সে নদীর পানি প্রায় দশহাত নিচে পড়ে। শহরের অভ্যন্তরে সারি সারি বৃক্ষরাজি এবং অগণিত ফলবাগান ছিল। এখানের আনারের বিশেষ খ্যাতি

---

২৪. শিজার অতি প্রাচীন একটি শহর। গ্রীকরা একে লারিসা বলত। ৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আরব মুসলমানরা সন্ধির মাধ্যমে এটি বিজয় করেন। ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ-জোন হওয়ায় বাইজেন্টাইনরা প্রায়ই এতে হামলা করত। ৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা এটি দখল করে নেয়। পরবর্তীতে আলী বিন মুনকিজের নেতৃত্বে মুসলমানরা পুনরায় এটি দখল করেন। তবে ভূমিকম্পের আঘাতে শহরটি পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সুলতান নুরউদ্দীন একে পুনরায় নির্মাণ করেন।
উসমানী শাসনামলে শহরটি তার গুরুত্ব হারায়। বর্তমানে এ শহরের বেশিরভাগ পরিত্যক্ত হলেও এর প্রবেশদ্বার এখনো অক্ষত রয়েছে। বিধ্বস্ত দেয়ালের শিলালিপিতে সুলতান নুরউদ্দীনের নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে। [ইন্টারনেট]
২৫. গ্রিক ভাষায় একে অরন্টেস বা ওরন্টেস বলা হয়। এর উৎস লেবাননে হলেও লেবাননসহ, সিরিয়া ও তুরস্কেও এটি বয়ে গেছে । [উইকিপিডিয়া]

ছিল। *শিজার* শহরটি [২৬]*হোমস* থেকে তেত্রিশ মাইল এবং [২৭]*আন্তাকিয়া* থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। শহরের প্রাচীর পোড়া ইট দ্বারা নির্মিত। তাতে ফটক ছিল তিনটি।'

আবু আসাকির অস্থিরচিত্তে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর আগমনের অপেক্ষা করছেন। তিনি স্বয়ং প্রাচীরের উপর অবস্থান নিয়ে ক্রুসেডারদের হামলা প্রতিরোধ করছেন। তবে তাঁর দৃষ্টি ছিল *শিজার* শহরের চারপাশের আকাশে নিবদ্ধ। তিনি আকাশের শূন্যে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত তীরের অপেক্ষা করছেন। কারণ এটি সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর আগমনের নিদর্শন। তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়নি। হঠাৎ তিনি আনন্দিত হয়ে উঠলেন। কারণ শূন্যে নিক্ষিপ্ত তীর জ্বলছিল; যার অর্থ—জেঙ্গী এসে গেছেন। তবে বিস্ময়কর এবং অনন্য বিষয় ছিল—জ্বলন্ত তীর শূন্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে রাতের নীরবতা ভেঙে, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে *আল্লাহু আকবার* ধ্বনি উচ্চকিত হয়। জেঙ্গীর বাহিনী মুহুর্মুহু তাকবির ধ্বনি দিয়ে ক্রুসেডারদের ওপর তীব্র আক্রমণ করেন।

একদিকে ইমাদউদ্দীন সসৈন্যে ক্রুসেডারদের ওপর আক্রমণ করেন, অন্যদিকে আবু আসাকিরও তাঁর বাহিনীর

---

২৬. হোমস বা হিমস। পূর্ব নাম এমিসা। জনসংখ্যার বিচারে সিরিয়ার তৃতীয় বড় শহর। রাজধানী দামেশক থেকে ১৬২ কিরোমিটার উত্তরে আসী নদীর তীরে এর অবস্থান। [উইকিপিডিয়া]

২৭. একটি ঐতিহাসিক নগরী। আসী নদীর বাম কোল ঘেঁষে ভূমধ্য-সাগরের ৩০ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। [উইকিপিডিয়া]

একটি ইউনিট নিয়ে দূর্গ থেকে বের হয়ে ক্রুসেডারদের ওপর হামলে পড়েন। তিনি পূর্বেই শহরে তাঁর বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে একাংশকে দূর্গের প্রাচীর হেফাজতের কাজে নিয়োজিত করেন। আর বাকি অংশটুকু নিয়ে তিনি ক্রুসেডারদের ওপর হামলা করেন। ইমাদউদ্দীন গণহারে তাদের হত্যা করতে থাকেন। ফ্রান্স এবং রোমান বাহিনীর কল্পনায়ও ছিল না যে, এই গভীর রজনীতে অকস্মাৎ মুসলমানদের কোনো বাহিনী তাদের ওপর এমন তীব্রবেগে হামলা করে তাদের সফলতা নিমিষেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে। তাদেরকে ন্যক্কারজনক পরাজয়ের স্বাদ আসাদন করতে পারে।

কুস্তুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) থেকে আগত রোমসম্রাটের বাহিনী এবং ফ্রান্সের সেনাবাহিনী *বাজা* নগরী বিজয়ের পর মনে করেছিল, মুসলমানদের শহরগুলো দখল করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। কারণ মুসলিম আমীর-উমরাদের অধিকাংশই তখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। তারা ক্রুসেডের এই মহাপ্লাবনকে প্রতিহত করার সময়টুকুনও পাবে না। কিন্তু যখন রাতের আঁধারে সমুদ্রঝড়ের ভয়ঙ্কর তরঙ্গাভিঘাতের মতো অকস্মাৎ জেঙ্গীর বাহিনী ক্রুসেডারদের ওপর আছড়ে পড়লো; তখন তাদের ভাবনা যে ভুল ছিল তা ভালোভাবেই তারা টের পেতে লাগল। তারা মুসলিম ভূখণ্ড দখলের প্ল্যান, তাদের চোখের সামনেই ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল।

রাতের আঁধারে একদিক থেকে জেঙ্গী আর অন্যদিক থেকে আবু আসাকিরের বাহিনী ক্রুসেডারদের কচুকাটা করেন। ক্রুসেডাররা নির্মমভাবে পরাজিত হয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকেই উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগলো। সে রাতে *শিজার* উপকণ্ঠে যেন কেয়ামত কায়েম হয়ে গিয়েছিল।

শিজার থেকে ক্রুসেডাররা পলায়নের পর ইমাদউদ্দীন ক্রুসেডারদের শহর *আরিকার* দিকে রোখ করেন। এই শহরটি ত্রিপলীর শাসনকর্তা *কাউন্ট অব ত্রিপলীর* অধীনে ছিল। সমুদ্র থেকে মাত্র তিন মাইলের দূরত্বে এর অবস্থান। ঐতিহাসিকগণ লেখেন– *আরিকা* পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন শহর ছিল। এ শহরের পাহাড়গুলো তেমন উঁচু ছিল না। একটি অনিন্দ্য সুন্দর আলো ঝলমলে নগরী হিসেবে এর খ্যাতি ছিল। শহরের একেবারে মধ্যভাগেই ছিল একটি দুর্ভেদ্য দূর্গ। নগরবাসীর কাছেও ছিল কাড়ি-কাড়ি সম্পদ। নদী থেকে নালার মাধ্যমে আনা হত সুপেয় ও সুমিষ্ট পানি। এতে করে শহরটি সবুজ শ্যামল ছিল। ফলদ-বৃক্ষ ছিল প্রচুর পরিমাণে। শহরের দালান-কোঠাগুলোয় ইট এবং চুনার ব্যবহার করা হত। ত্রিপলী থেকে এর দূরত্ব ছিল বার মাইল। আর এখান থেকে ইতিহাসখ্যাত নগরী *বালাবাক্কা* ছিল ছাব্বিশ মাইল দূরত্বে। কথিত আছে, *বালাবাক্কা* বা *বিলবাক* শহরের আলোচনা তাওরাতেও এসেছে।

মুসলমানরা এই শহরটিকে *আরিকা* বললেও খ্রিষ্টানরা একে *আর্কিডোস* বলত।

যাই হোক, *শিজার* থেকে ক্রুসেডাররা পলায়ন করার পর ইমাদউদ্দীন *আরিকা* অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি দূর্গে হামলা করে প্রহরীদের গণহারে হত্যা করেন। শহরে যে ক্রুসেডসৈন্যরা বিদ্যমান ছিল, কেউই রেহাই পায়নি জেঙ্গীর হাত থেকে। *কাউন্ট অব ত্রিপলী* সাহায্যের জন্য রওয়ানা দিয়েছিলেন বটে; তবে তার পৌঁছার আগেই ইমাদউদ্দীন শহর পদানত করে শহর এবং দূর্গ উভয়টিকে আক্ষরিকভাবেই ধ্বংস করে দেন। যাতে অনাগত ভবিষ্যতে আর কখনো ক্রুসেডাররা সেখানে অবস্থান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে না পারে।

বালাবাক্কা বা বিলবিক নগরী সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মূল্যায়ন

আরিকার বিজয়ের পর ইমাদউদ্দীন এবার *বালাবাক্কা* অভিমুখে অগ্রসর হন। এটি তখন ক্রুসেডারদের দখলে ছিল।

বালাবাক্কা শামের তিলোত্তমা নগরীগুলোর মধ্যে গণ্য হত। পাথরে নির্মিত নয়নাভিরাম সারি-সারি অট্টালিকা

ছিল এখানে। একেবারে ছবির মতো দেখতে যেন! শহরে একটি বিস্ময়কর জলাধার ছিল। এর পানি নালার মাধ্যমে শহরের সর্বত্র পৌঁছানো হত।

ঐতিহাসিক মাসউদী লেখেন,

'বালাবাক্কা একটি সবুজ শ্যামল মনোরম শহর ছিল। এখানে *বাআল দেবতার* মন্দির ছিল। আর *বাআল* কিন্দীদের দেবতা। প্রাচীন গ্রীকরা *জাবালে লুবনান* (লেবানন পর্বত) এবং *জাবালে শিজারের* মধ্যবর্তী এই স্থানটিকে দেবতাদের পূজা অর্চনার জন্য উত্তম স্থান ভেবে এখানে গির্জা নির্মাণ করে। *বালাবাক্কায়* গ্রীকদের সে মন্দিরে দুটি প্রাসাদ ছিল বলে কথিত আছে।। একটি বড়। আরেকটি প্রথমটার তুলনায় ছোট। এই প্রাসাদে বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্পের ব্যবহার করা হয়েছিল।'

আরেক ঐতিহাসিক মাকদেসী লেখেন,

'*বালাবাক্কা* একটি প্রাচীন দূর্গবেষ্টিত অঞ্চল। এখানে প্রচুর আঙুরের চাষ হত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলা হত একে। তাছাড়া শহরটির ভৌগোলিক অবস্থানও এমন স্থানে যে, এর চাষবাসের জায়গাজমি *আসী* নদীর পানিতে সিঞ্চিত হত। শামের সবচেয়ে শীতলতম অঞ্চল মনে করা হত এ-শহরকে। *বালাবাক্কা* শহরের *মালবান* নামের একধরনের মিষ্টান্নের খ্যাতি ছিল।'

ঐতিহাসিক ইদরিসী *বালাবাক্কা* শহর সম্পর্কে লেখেন, '*বালবাক্কা* পাহাড়ের ঢালুতে দূর্গবেষ্টিত একটি শহর। দূর্গের বেষ্টন ছিল এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা। প্রাচীরের প্রস্থ ছিল বিশ গজের মতো। শহরের অলি-গলিতে নালার মাধ্যমে পানি সাপ্লাই করা হত। পাশের নদী থেকে পানি উত্তোলনের জন্য চর্কার মতো একধরনের নলকূপ ব্যবহৃত হত। এখানে এতো বেশি আঙুর চাষ হত যে, এর সংরক্ষণের জন্য কারখানা নির্মাণ করা হয়েছিল। আঙুর ছাড়াও এখানে নানান জাতের ফলমূলের চাষাবাদ হত। যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র এখানে সস্তায় এবং অনায়াসে পাওয়া যেত।

বালাবাক্কা শহরে বিস্ময়কর অনেক ইমারত ও পোড়ো বাড়ি ছিল—নান্দনিকতা আর স্থায়িত্বে যেগুলো ছিল জগৎবিখ্যাত। তবে, সবচেয়ে বিস্ময়কর দুটি প্রাসাদের বিবরণ পাওয়া যায়; স্থাপত্বশৈলী আর কারুকার্যে যেদুটির তুলনা মেলা ভার। বিনোদনের জন্য তাই দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে বেড়াতে আসত।

একটি প্রাসাদ ছিল বড়। অন্যটি তার তুলনায় ছোট। জনশ্রুত আছে, প্রাসাদ দুটি নবী সুলাইমান আ.-এর যুগে নির্মাণ করা হয়। বাস্তবেও প্রাসাদ দুটি দেখে যে কেউ আশ্চর্য হতে বাধ্য। এগুলোর নির্মাণে কোথাও দশ হাত আবার কোনো স্থানে তার চেয়েও বড় পাথরের গাঁথুনি ব্যবহৃত হয়েছে। ইমারতের একটা অংশ উঁচু-উঁচু খুঁটির

উপর এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, দর্শনার্থীগণ অবিভূত না হয়ে পারে না।

ঐতিহাসিক ইয়াকুতের ভাষায়,

'*বালাবাক্কা* শহরের মর্মর পাথর দ্বারা নির্মিত প্রাগৈতিহাসিক প্রাসাদ ও বিস্ময়কর স্থাপনাগুলো আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। শহরটি উপকূল থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তাছাড়া শহরটি *বাআল* দেবতার মন্দিরের কারণেও প্রসিদ্ধ। আর এই *বাআল* দেবতার নামানুসারেই শহরের নামকরণ করা হয় *বালবাক্কা*।'

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'শহরটি একসময় সুলাইমান আ.-এর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। যখন তিনি রাণী বিলকিসের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন, তখন তিনি এই শহরটি রাণীকে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। এখানে সুলাইমান আ.-এর নির্মিত একটি প্রাসাদও বিদ্যমান ছিল। যেটি সম্পূর্ণ থামের উপর স্থাপিত। তাছাড়া এখানের পর্বতের উপর গ্রীকদের প্রাচীন একটি মন্দিরও ছিল। তবে শহরটি *বাআল* দেবতার নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর *বাআল* ছিল সেই সম্প্রদায়ের মূর্তি, যাদের কাছে আল্লাহ নবী ইলিয়াস আ. কে প্রেরণ করেছিলেন।'

আরেকজন ইতিহাসবিদ দিমাশকি লেখেন, '*বালাবাক্কা* অতিপ্রাচীন একটি নগরী। যেখানে ইবারাহিম, মূসা, সুলাইমান আ. এবং গ্রীক সভ্যতার সময়কার পুরোনো

নিদর্শনাদি বিদ্যমান রয়েছে। এখানে চল্লিশহাত উঁচু-উঁচু স্তম্ভ স্থাপিত ছিল।'

দিমাশকি বিস্ময় প্রকাশ করে এ-ও লিখেছেন, '*বালাবাক্কা* শহরের একটি মনোরম প্রাসাদের তিনটি পাথরের দৈর্ঘ্য ছিল ছত্রিশ কদম এবং প্রস্থ দুই কদম সমপরিমাণ!'

দিমাশকি লেখেন, 'সেই বিস্ময়কর প্রাসাদে একটি কূপও ছিল, যাকে *বিরে রহমত* নামে ডাকা হত। জনশ্রুত ছিল যে, শান্তি ও স্থিতাবস্থায় সেই কূপ পানি দিত না। কিন্তু যখনই *বালাবাক্কা* শহর যুদ্ধকবলিত হত, অবরুদ্ধ হত কিংবা শহরের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত; তখন সেই কূপটিতে পানির প্রচুর প্রবাহ দেখা দিত। আবার শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসতেই পানি তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত।'

আরেক ইতিহাসবিদ আবুল ফিদার ভাষায়, '*বালবাক্কা* শহরটি পাহাড়ের উঁচুতে অবস্থিত প্রাচীন একটি নগরী। এর দূর্গ-পাঁচিল অত্যন্ত মজবুত এবং দুর্ভেদ্য। শহরে পর্যাপ্ত সুপেয় পানির নদী-নালা, সরোবর এবং উন্নত জিনিষপত্র বিদ্যমান ছিল।'

বিখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবনে বতুতা *বালাবাক্কা* শহর পরিদর্শনের পর শহরটি সম্পর্কে লিখেছেন, '*বালাবাক্কা* একটি অনিন্দ্য সুন্দর নগরী। মনোরম উদ্যান আর সবুজ অরণ্য চারদিক থেকে একে বেষ্টন করেছিল। সৌন্দর্যের

দিক দিয়ে দামেশকের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। এখানে এক বিশেষধরনের সুস্বাদু মোরব্বা তৈরী হত। আঙুরের রস নিংড়ে বের করে, তাতে একধরনের ছাতুজাতীয় বস্তুর মিশ্রণ করা হত। উভয়টাকে ভালোভাবে মিশিয়ে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় শিরা বানানো হত। তারপর এতে পেস্তা বাদাম মিশিয়ে তৈরি করা হত মিষ্টান্ন বা হালুয়া। যা *মালবান* নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

বালাবাক্কার বিজয়

আরিকা শহরকে বিধ্বস্ত এবং ধ্বংস করে দিয়ে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী দ্রুত রওয়ানা করেন ক্রুসডারদের ঘাঁটি *বালাবাক্কা* শহর অভিমুখে। শহরের অভ্যন্তরে ক্রুসেডারদের এক বিশাল বাহিনী তখন বিদ্যমান ছিল। জেঙ্গীর বাহিনীর চেয়ে সংখ্যায় তারা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু দুশমনের সংখ্যাধিক্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সুলতান আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করলেন।

শহরের কাছাকাছি পৌঁছে, সুলতান তাঁর বাহিনীকে শহর অবরোধ করার নির্দেশ দেন। অভিযানের পর অভিযান। লাগাতার অভিযান। সুলতান নিজে যেমন সামান্য বিশ্রাম গ্রহণ করলেন না, সেনাবাহিনীকেও বিশ্রামের সুযোগ দিলেন না। শহরের দুর্ভেদ্য পাঁচিলের কাছাকাছি হতেই হামলে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

নির্দেশ পেয়েই তাঁর জানবায, মুজাহিদরা শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শহরের পাঁচিলের উপরও শত্রুর বিশাল বাহিনী বিদ্যমান ছিল। বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করে তারা মুসলিম বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। মুসলিম বাহিনীকে পাঁচিল থেকে দূরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল তারা। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর বীর মুজাহিদরা অভিনব এক পন্থা অবলম্বন করেন। তারা মাথায় ঢাল বেধে মুহূর্তের মধ্যে পাঁচিলের ওপর আরোহণ করতে সক্ষম হন। মুসলিমবাহিনীর ক্ষীপ্রতা দেখে দূর্গরক্ষী ক্রুসেডবাহিনী ভীত হয়ে পড়ে।

পাঁচিলে আরোহণ করে তারা পাঁচিলরক্ষক বাহিনীকে ধরাশায়ী করে ফেলেন। এরপর জেঙ্গীর সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে বীরদর্পে লড়াই করতে থাকেন। একপর্যায়ে দূর্গের একটি ফটক খুলে দিতে সক্ষম হন। ফটক উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী বাহিনী নিয়ে ক্ষীপ্রতার সাথে শহরে প্রবেশ করেন। শহরের অভ্যন্তরে তখনও শত্রুবাহিনীর সংখ্যা তাঁর বাহিনীর চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু অকুতোভয় মুজাহিদ সুলতান ইমাদউদ্দীন সংখ্যাধিক্যের পরোয়া না করে হামলে পড়েন ক্রুসেডারদের ওপর। এতে শহরের অভ্যন্তরে ভয়াবহ এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যায়।

ফলাফল– ইমাদউদ্দীনের জানবায মুজাহিদরা শত্রুবাহিনীকে পরিপূর্ণভাবে পরাস্ত করে স্বল্প সময়ের

মধ্যেই শহরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিজয় ইমাদউদ্দীনের জন্য অনেক বড় সফলতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

বালাবাক্কা বিজয়ের পর সুলতান ইমাদউদ্দীন সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে শহরের নিয়মকানুন সংশোধন করেন। নিশ্চিত করেন শহরের সুরক্ষা। এরপর তিনি সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর পিতা নাজমউদ্দীন আইয়ুবীকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। এটি ছিল যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এভাবেই তিনি নাজমউদ্দীনের সহযোগিতা এবং অনুগ্রহের প্রতিদান দেন উত্তমভাবে। যে অনুগ্রহ নাজমউদ্দীন আইয়ুবী সুলতানকে করেছিলেন।

ঘটনা ছিল, যখন সুলতান ইমাদউদ্দীন সৈন্যসহ বাগদাদ থেকে পিছু হটে মসুলে পলায়নের পথে তিকরিত এসে বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁর বাহিনীতে নদী পাড়ি দেয়ার মতো কোনো নৌকা ছিল না। অথচ খলিফার বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে চলছিল। সেই নাজুকতম মুহূর্তে, এই নাজমউদ্দীন আইয়ুবীই সুলতানকে নদী পারাপারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এতে সুলতান নিজের বাহিনীসহ নিরাপদে নদী পাড়ি দিয়ে মসুল পৌঁছুতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে এই অপরাধে নাজমদ্দীনকে *তিকরিতের* গভর্নরপদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। তখন নাজমউদ্দীন স্বপরিবারে মসুল এসে সুলতান

ইমাদউদ্দীনের কাছে আশ্রয় নেন। সুলতান নাজমউদ্দীনের সেই অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ তাকে *বালাবাক্কা* শহরের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীর ঐতিহাসিক পরাজয়

ইমাদউদ্দীন *বালাবাক্কা* শহর বিজয় করে সেখানে অবস্থান করছিলেন। এই সুযোগে ক্রুসেডাররা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাপক ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। ইতোপূর্বে ফ্রান্স এবং কনস্টান্টিনোপলের যৌথবাহিনী ইমাদউদ্দীনের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল। এ পরাজয়ের পর ফরাসী বাহিনী জেরুসালেমের রাজা বল্ডুইনের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর কনস্টান্টিনোপলের বাহিনী স্বদেশে ফিরে যায়। তাদের পরাজয়ের সংবাদ যখন ইউরোপ পৌঁছে, তখন জার্মানি বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলে ইমাদউদ্দীনের কাছে ক্রুসেডারদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে। জার্মানরা কনস্টান্টিনোপলের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। যাতে জার্মান সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপল পৌঁছার আগেই সেখানকার সৈন্যরা প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। এরপর জার্মানি এবং কনস্টান্টিনোপলের যৌথ বাহিনী মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পাশাপাশি তারা জেরুসালেমের বাদশাহ বল্ডুইনের কাছেও দ্রুতগতিতে দূত প্রেরণ করে। বল্ডুইন দূতমারফত

জবাব পাঠায় যে, সে কেবল তার অধীন বাহিনীই নয়; বরং জেরুসালেমে অবস্থিত ফরাসী সৈন্যদেরও সাথে নিয়ে বাহরাইনের দিকে অগ্রসর হবে। ওদিকে জার্মানি এবং কনস্টান্টিনোপলের যৌথ বাহিনীও বাহরাইন এসে মিলিত হবে।

বাহরাইন সেসময় ক্রুসেডারদের দখলে। পূর্বে থেকেই সেখানে বিশাল এক বাহিনী বিদ্যমান ছিল।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল আসির লেখেন,

'বাহরাইনের উপর খ্রিষ্টানদের দখলদারিত্বের কারণে এর চারপাশের অঞ্চলগুলোতে লুটতারাজ এবং চুরি-ডাকাতির পরিমাণ এতোই বেড়ে গিয়েছিলো যে, দিনের বেলায়ও এপথে একাকি কারো সফর করার সাহস হতনা। বাহরাইন থেকে আলেপ্পোগামী পথও একেবারে বিরান হয়ে পড়েছিল।

মোটকথা, ইউরোপ এবং এশিয়ার ক্রুসেডারদের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জেরুসালেম থেকে আগত বাহিনী বাহরাইনের দিকে রোখ করবে। আর জার্মানি এবং কনস্টান্টিনোপলের যৌথ বাহিনীর গন্তব্যও হবে বাহরাইন। সম্মিলিত বাহিনী বাহরাইন এসে মিলিত হয়ে ইমাদউদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ছক আঁকবে এবং সেই অনুপাতে যুদ্ধ পরিচালনা করবে।

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরই জেরুসালেমের রাজা বল্ডুইন এবং ফ্রান্সের সম্রাট নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে বাহরাইন অভিমুখে রওয়ানা হয়। জেঙ্গীর গুপ্তচররাও বসে ছিল না। তারা ক্রুসেডারদের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল। আর সুলতানের কাছে সংবাদ প্রেরণ করছিল। সুলতান তাদের বাহরাইন অভিমুখে ছুটে আসার সংবাদ পাওয়ামাত্র *বালাবাক্কা* ছেড়ে দ্রুততার সাথে বাহরাইনের দিকে রোখ করেন। জেরুসালেম এবং ফ্রান্সের সম্রাটদের ইচ্ছে ছিল, বাহরাইন পৌঁছে জার্মানি এবং কনস্টান্টিনোপলের সম্মিলিত বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করা। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, তারা তখনও বাহরাইনের আশেপাশেই অবস্থান করছিল, আকস্মিক ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সসৈন্য তাদের সম্মুখে উদয় হন এবং তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ান।

বস্তুত এটা ছিল বিশ্বাসের লড়াই। ক্রুশ বনাম ইসলামের লড়াই। জেরুসালেমের রাজার অধীনেই তখন জেঙ্গীর বাহিনী থেকে কয়েকগুণ বেশি সৈন্য ছিল। তারপর আবার ফ্রান্সের সেনাসংখ্যা ছিল জেরুসালেমের বাহিনীর চেয়েও বেশি। তবুও সুলতান ইমাদউদ্দীন নিজ বাহিনীর চেয়ে চার-পাঁচগুণ বড় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন।

ইতিহাসগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে, 'বাহরাইনের অনতিদূরেই জেরুসালেম ও ফ্রান্সের সম্মিলিত বাহিনীর

সাথে জেঙ্গীর বাহিনীর ভয়াবহ ও ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইমাদউদ্দীন ক্রুসেডারদের চরমভাবে পরাজিত করেন। ফ্রান্স এবং জেরুসালেমের সম্রাটদ্বয় কোনোমতে পালিয়ে বাঁচেন।'

বাহরাইনের ক্রুসেডারদের ওপর ইমাদউদ্দীনের পূর্ব থেকেই প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল। কারণ তারা লুটতরাজ করে আশপাশের মুসলিম জনপদগুলোতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করত। তাদের অত্যাচারে জনজীবন বিষিয়ে উঠেছিল। তাই ফ্রান্স আর জেরুসালেমের বাহিনীকে শায়েস্তা করার পর ইমাদউদ্দীন বাহরাইনের দিকে অগ্রসর হন।

বাহরাইনের দূর্গটি অনেক মজবুত ছিল। তাই দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থানরত ক্রুসেডার বাহিনীর মনোবল ছিল চাঙ্গা। তারা তো ধরেই নিয়েছিল, ইমাদউদ্দীনের মতো একজন সেনাপতি আর কি-ই বা করতে পারবে? দূর্গ অবরোধ করে সামান্য কদিন দূর্গপাঁচিলের সাথে মাথা ঠোকাঠুকি করে ফিরে যাবে!

তবে এ তাদের কল্পবিলাস ছিল। ইমাদউদ্দীন যে ভিন্ন ধাতুতে তৈরি তা সহসাই তারা টের পায়। বাহরাইনের সন্নিকটে পৌঁছেই ইমাদউদ্দীন শহর অবরোধ করে ফেলেন। এরপর শুরু হয় তীব্র আক্রমণ। আক্রমণের তীব্রতা এতোই বেশি ছিল যে, দূর্গের অভ্যন্তরের ক্রুসেডাররা ভরকে যায়। ইত্যবসরে ইমাদউদ্দীনের কিছু

সেনা দূর্গের পাঁচিলে চড়ে কয়েকটি বুর্জ ধ্বংস করে দেয়। এতে অনায়াসেই দূর্গ-পাঁচিলের একটি অংশ মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এরপর বেশকিছু সৈন্য পাঁচিলের ওপর চড়ে অবশিষ্ট দূর্গরক্ষীদের হত্যা করে। এ পর্যায়ে তারা দূর্গের ফটক খুলে দেয়। ফলে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী সসৈন্যে শহরে প্রবেশ করে ক্রুসেডারদের অবশিষ্ট সৈন্যদেরও জমালয়ের টিকেট ধরিয়ে দেন। এভাবেই রচিত হয় আরেকটি জেঙ্গী মহাকাব্য। *বালাবাক্কা* শহরের পর বাহরাইনের ওপরও তিনি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, বাহরাইনের ওপর ইমাদউদ্দীনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর এই অঞ্চল পুনরায় আবাদ হয়। এটি তার হৃত-প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়। এর কারণ হচ্ছে, বাহরাইনের উপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, আশপাশের এলাকাগুলোতে ক্রুসেডাররা যে লুটতারাজ চালাত, তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বাহরাইন দখল করার পর ইমাদউদ্দীন তাতে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে সুখ-শান্তি ফিরিয়ে আনেন। ক্রুসেডার-কর্তৃক সেখানকার যে অধিবাসীরা ভিটেমাটি হারিয়েছিল, ইমাদউদ্দীন তাদের সরকারি খরচে ঘরবাড়ির ব্যবস্থা করে দেন।

বাহরাইনের পর এবার ইমাদউদ্দীন সসৈন্য *মাআররাতুন নুমানের* দিকে অগ্রসর হন। এই শহরটিও একসময় মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু পরবর্তী

সময়ে ক্রুসেডাররা তা দখল করে নেয়।

এক ইরানি পরিব্রাজক নাসির খসরু তার ডায়রীতে এই শহরটি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'শহরের চারপাশের প্রাচীর বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত ছিল। যা শহরটিকে দুর্ভেদ্য করে রেখেছিল। শহরের প্রধান ফটকের উপর এক প্রকাণ্ড খুঁটি ছিল; যাতে অনারবী ভাষার হস্তলিপিতে বিভিন্নধরনের লেখা ছিল।'

তিনি লেখেন, 'খুঁটিতে অঙ্কিত সেই লেখাগুলো, অনারবী ও দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে তিনি পড়তে পারছিলেন না। স্থানীয় এক ব্যক্তিকে লেখাগুলো কোন্ ভাষায় তা জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, এগুলো প্রাচীন কোন বর্ণমালায় লেখা।'

জনশ্রুতি আছে, এগুলো নাকি বিচ্ছুর উৎপীড়ন থেকে সুরক্ষিত থাকার মন্ত্র। আর এগুলোর কারণেই *মাআররাতুন নুমানে* কোনো বিষাক্ত বিচ্ছু ও সাপ-জোঁক ঢুকতে পারে না। আর ঢুকে পড়লেও থাকতে পারে না। বাইরে থকে এনেও যদি কোনো ধরনের বিষাক্ত বিচ্ছু শহরের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা বের হয়ে যায়।

যেই প্রকাণ্ড খুঁটিতে বিচ্ছু থেকে সুরক্ষিত থাকার মন্ত্র লেখা ছিল, তা আনুমানিক দশ হাত উঁচু ছিল।'

আরো লিখেছেন, 'শহরের মধ্যভাগে উঁচুস্থানে একটি সুরম্য জামে মসজিদ ছিল; যার চতুর্পাশে সিঁড়ির ব্যবস্থা ছিল। তাই যে কোন দিক থেকে মসজিদে প্রবেশ করতে চাইলে সিঁড়ি ভেঙেই ঢুকতে হত।'

ঐতিহাসিক ইদরিসি লেখেন, 'শহরটির অবকাঠামো বেশ উন্নত হওয়ায় শহরটি আবাদ ছিল। এর বাজার-হাট বেশ মানসম্পন্ন ছিল। হাটুরেদের পদচারণায় গমগম করত। শহরের কাছেধারে জলাধার কিংবা পানির সুব্যবস্থা ছিল না। আশপাশের ভূমি বালুময় ছিল। বৃষ্টির পানিতেই পরিপূর্ণ নির্ভরশীল ছিল শহরের মানুষ। এতকিছুর পরও সেখানে যাইতুন, পেস্তা বাদাম এবং আঙুর অধিকহারে চাষাবাদ হত।'

ঐতিহাসিক ইয়াকুত লেখেন, 'এই শহরটির নামকরণ করা হয় প্রিয় নবীজির সাহাবী নুমান ইবনে বশির রাযি. র নামে। পূর্বে শহরটির নাম ছিল *জাতুল কাসির*। নুমান ইবনে বশির রাযি. এখানে ইন্তেকাল করেন এবং এখানেই তাঁর সমাধি হয়।'

বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা শহরটি সম্পর্কে লেখেন, 'এই শহরে কেবল প্রিয় নবীজির সাহাবী নুমান ইবনে বশির রাযি.ই সমাহিত নন; বরং এই শহরের একেবারে সন্নিকটে খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযিয রহ. র সমাধিও বিদ্যমান।

যাই হোক, ইমাদউদ্দীন '*মাআররাতুন নুমানের* মজবুত দূর্গে জোরদার হামলা করেন। দূর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান করা ক্রুসেডাররা প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তবে জেঙ্গীর আক্রমনের প্রাথমিক ধাক্কাই তারা সামাল দিতে পারে নি। তাদের সবধরনের প্রতিরোধ খড়কুটোর মতোই ভেসে যায়। ইমাদউদ্দীন প্রথম আক্রমণেই *মাআররাতুন নুমান* বিজয় করেন।

তারপর ইমাদউদ্দীন অন্য আরেকটি শহর *কুফরতাবের* দিকে রোখ করেন। আর কোনো বাধার সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই শহরটি বিজয় করে নেন। শহরের অভ্যন্তরে থাকা সৈন্যদের হত্যা করেন।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, 'পূর্বে ক্রুসেডাররা যখন মুসলমানদের এই শহরটি দখল করেছিল, তখন তারা শহরের বাসিন্দাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করেছিল। কিন্তু ইমাদউদ্দীন যখন উপরোক্ত দুটি শহর বিজয় করেন, তখন তিনি উসওয়ায়ে নবী তথা নববী আদর্শের ওপর আমল করে খ্রিষ্টানদের সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করেছিলেন। নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জিনিসপত্র নিয়ে তাদের শহর ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা তাঁর বড় মন এবং কোমল স্বভাবেরই পরিচয়।'

যে দিনগুলোতে ইমাদউদ্দীন [২৮]মাআররাতুন নুমান এবং [২৯]কুফরতাব বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ক্রুসেডাররা তাঁর এই ব্যস্ততার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরেকবার নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করার ইচ্ছা করে।

জার্মানি, কনস্টান্টিনোপল, ফ্রান্স এবং জেরুসালেমের সম্মিলিত বাহিনী ইমাদউদ্দীনের অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের বৃহৎ শহর আলেপ্পো দখলের ফন্দি আঁটে। আর এ লক্ষ্যে তারা আলেপ্পোর দিকে অগ্রসর হয়। শহরের সন্নিকটে পৌঁছেই তারা তা অবরুদ্ধ করে ফেলে। আলেপ্পোতে তখন ইমাদউদ্দীনের একজন নায়েব তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। মুসলমানদের একটি সৈন্যবাহিনীও সেখানে ছিল। তারা সর্বশক্তি ব্যয় করে ক্রুসেডারদের ঠেকিয়ে রাখে। ওদিকে দ্রুতই জেঙ্গীর কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। তিনি ঝড়ের গতিতে আলেপ্পোর উপকণ্ঠে পৌঁছে যান। ক্রুসেডার সৈন্যবাহিনী আলেপ্পোর চারপাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল। রাত গভীর হতেই আকস্মিক জেঙ্গীর বাহিনী ক্রুসেডারদের ওপর বজ্রের মতো আঘাত হেনে তাদের গণহারে হত্যা শুরু করে। ক্রুসেডারদের ভাগ্যে জুটে আরেকটি লাঞ্ছনাকর পরাজয়। যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে বাঁচে।

---

২৮. ইরাকের একটি শহর।
২৯. বর্তমান সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের একটি শহর।

ইতিহাসখ্যাত আর-রুহা বিজয়

ক্রুসেডারদের থেকে বহু শহর-নগর এবং দূর্গ ছিনিয়ে নেয়ার পর ইমাদউদ্দীন এবার একটি বড় এবং দুর্ভেদ্য কেল্লার ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।[৩০]*আর-রুহা* বা *এডেসা* নামে যেটি বিখ্যাত। ইউরোপের ক্রুসেডাররা যখন এশিয়ার মুসলমানদের ওপর হামলা করেছিল, তখন সর্বপ্রথম তারা এই শহরের ওপরই অন্যায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেখানে তখন ফ্রান্সের জোসেলিন দ্বিতীয়-র শাসন চলছিল।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, *আর-রুহা* বা *এডেসাকে* ক্রুসেডাররা তাদের পঞ্চম ধর্মীয় পবিত্রভূমি বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। তাদের পাঁচটি পুণ্যভূমি হল—**প্রথম.** *জেরুসালেম*। **দ্বিতীয়.** এন্তাকিয়া (*এন্টিওক*)। **তৃতীয়.** *রোম*। **চতুর্থ.** *কনস্টান্টিনোপল* এবং **পঞ্চম.** নাম্বারে এই *এডেসা*।

এডেসা *মেসোপটেমিয়া* অর্থাৎ *আল-জাজিরার* প্রাণভোমরা মনে করা হত। ক্রুসেডাররা সেখানে মজবুত ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। এখানে সৈন্য, যুদ্ধের রসদ এবং যাবতীয় সব সরঞ্জাম সদা প্রস্তুত থাকত। তাছাড়া মুসলমানদের তরফ থেকে শহরের নিরাপত্তার ব্যাপারে ন্যূনতম আশঙ্কা দেখা দিলেও, তৎক্ষণাৎ জেরুসালেমের

---

৩০. বর্তমান সিরিয়ার ইদলিব প্রদেশের একটি শহর।

বাদশাহ বল্ডুইন সসৈন্যে এর সুরক্ষার জন্য এগিয়ে আসত।

এডেসা খ্রিষ্টানদের শাসনাধীন হওয়ার কারণে মসুল, বাগদাদ এবং [৩১]দিয়ারে বকরসহ আশপাশের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা সদা আতঙ্কিত থাকতো। তাই সার্বিক বিবেচনায় এই শহরটির রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

ইতোপূর্বে অনেক দূর্গপতি, করদরাজ্যের গভর্নর এবং শাসকরা এই শহরে আক্রমণ চালান এবং তা দখলের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন; কিন্তু কেউ-ই সফলতা পাননি। তবে এবারের আক্রমণকারী হচ্ছেন বীর-শার্দুল সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী। যিনি দুশমনের ওপর ভয়ঙ্কর মরুঝড়ের মতো হামলে পড়তে পারেন। পারেন সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গাভিঘাতের মতো আছড়ে পড়তেও।

ঐতিহাসিকরা লেখেন, '১১৪৩ সালের নভেম্বর মাসের কোনো একদিনে ইমাদউদ্দীন সসৈন্যে *এডেসা* শহরের সন্নিকটে পৌঁছেন। প্রথমেই তিনি শহরকে পরিপূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করে ফেলেন। তবে ইমাদউদ্দীন

---

৩১. আরবীতে এটি অরফা, গ্রীক ভাষায় আদিসা আর প্রাচীন সিরীয় ভাষায় অরহাই নামে প্রসিদ্ধ। এ শহরটি প্রাচ্যের খ্রিষ্টানদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল। মুসলিমবিশ্বে অবস্থিত খিষ্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জাটি এখানে রয়েছে। ১০৯৮ থেকে ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এটা তাদের দখলেই ছিল। পরবর্তীতে সুলতান ইমাদউদ্দীন এটি বিজয় করে নেন। [উইকিপিডিয়া]

ছিলেন কোমলপ্রাণ মানুষ। তাই তিনি শহরের ফ্রান্সিস শাসনকর্তা জোসেলিনের কাছে বার্তা প্রেরণ করেন যে,

'আমার বাহিনী শহরকে পরিপূর্ণভাবে সিল করে দিয়েছে। এই অলীক ধারনা কক্ষনো করো না যে, আমি এই অবরোধ উঠিয়ে প্রস্থান করব। আমি এবং আমার সেনারা দূর্গ পদানত না করে একচুল পরিমাণও নড়বে না। সুতরাং তোমাদের জন্য মঙ্গল হবে, নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে শহর আমাদের কাছে সোপর্দ করে দাও।'

তবে শহরের অভ্যন্তরে যেহেতু ক্রুসেডারদের বিশাল এক বাহিনী অবস্থান করছিল, সেহেতু শহরের ফ্রান্সিস শাসনকর্তা জোসেলিন ইমাদউদ্দীনের এমন উদার মনোভাবের পরোয়া না করে লড়ার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে। ইমাদউদ্দীন কালক্ষেপণ না করে অনবরত তীব্র আক্রমন শুরু করেন। একটানা আটাশ দিন অবরুদ্ধ রেখে অবিরতভাবে তাদের ওপর হামলা করে দূর্গের অভ্যন্তরে থাকা সেনাবাহিনী এবং অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেন। অবশেষে ১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর তিনি বিজয়ীবেশে শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

যেহেতু এদূর্গ থেকে আশপাশের মুসলমানদের ওপর বীভৎসতম নিধনযজ্ঞ চালানো হত, তাই প্রতিশোধ স্বরূপ মুসলিম বাহিনী শহর দখলে নেয়ার পর ক্রুসেডারদের গণহারে হত্যা করতে শুরু করে। কারণ মুসলিম বাহিনী

তখন জোশ-জযবা এবং প্রতিশোধের স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। তারা শহরের একাংশে লুটপাটও চালায়। কিন্তু ইমাদউদ্দীন বড় রহমদিল এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ জারি করেন,

'কোনো নিরপরাধ ও নিরস্ত্রকে যেন ধমক পর্যন্ত না দেয়া হয়।'

সাথে তিনি যুদ্ধবন্দি খ্রিষ্টান সৈন্যদেরও মুক্ত করে দেন। তাছাড়া ইমাদউদ্দীনের সৈন্যরা যে সম্পদ লুট করেছিল, তাঁর নির্দেশে তারা সেই সম্পদও ফিরিয়ে দেয়।

মুসলমানদের *এডেসা* বিজয়ে সমগ্র খ্রিষ্টানবিশ্ব শোকে মাতম করতে থাকে। তারা কল্পনাও করেনি এমন কিছু ঘটতে পারে। ইমাদউদ্দীনের মতো একজন নগণ্য গভর্নর সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে, কীভাবে তাদের মজবুত ও দুর্ভেদ্য দূর্গের শহর *এডেসা* বিজয় করলো? এমনকি খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক *ফিলিপ হাট্টা* তো লিখেছেন, 'এডেসা খ্রিষ্টানদের সেসব রাজ্যসমূহের অন্তর্গত ছিল, যেগুলো সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্বপ্রথম যেগুলোর পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।'

তিনি লেখেন, 'এ বিজয়ের ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিস্থিতি এখন মুসলমানদের অনুকূলে।'

আল্লামা ইবনুল আসির তাঁর বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থে লেখেন, 'এডেসার বিজয়কে *ফাতহুল* ফুতূহ বা মহাবিজয় হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। এই বিজয়ে তদানীন্তন বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। কবিরা ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর শানে কাব্যের ফোয়ারা বইয়ে দিয়েছিল। উলামা এবং ফকিহগণ তাকে *মুহাফিজে ইসলাম* এবং *মুজাহিদে কাবির* উপাধিতে ভূষিত করেন। এমনকি বাগদাদের খলিফার সঙ্গে অতীতে ইমাদউদ্দীনের সম্পর্ক তিক্ত হওয়া সত্ত্বেও খলিফা বাগদাদে জুমার খুতবায় ইমাদউদ্দীনের নাম উল্লেখ করার নির্দেশ জারি করেন।

এডেসা পদানত করে ইমাদউদ্দীন ক্রুসডারদের আরো কিছু দূর্গও বিজয় করেন। তাতে ইসলামি ঝাণ্ডা সমুন্নত করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দূর্গের নাম হচ্ছে *সুরুজ* বা *স্যাডেলস*।

অবশেষে বীর অশ্বারোহীর অন্তীম যাত্রা...

ক্রুসেডাররা জেঙ্গীর একের পর এক বিজয়াভিযানে প্রমাদ গুণতে লাগলো। পুরো খ্রিষ্টবিশ্বে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। ইমাদউদ্দীন একে একে তাদের থেকে সেই সব অঞ্চল ও শহরগুলো পুনরুদ্ধার করে ফেলেন, যেগুলো তারা ইতোপূর্বে মুসলমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। প্রতিদিনই চারদিকে কেবল ক্রুসেডারদের

পরাজয়ের সংবাদই আসছিল। ইমাদউদ্দীন তাদের কাছে এক আতঙ্কের নাম। তাকে থামানো না গেলে কুদস তাদের হাতছাড়া হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর তাই খ্রিষ্টানরা ময়দানে না পেরে তাদের চিরচরিত স্বভাব অনুযায়ী ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা [৩২]এক বাতিনী ফেদাইনকে মোটা অংকের লোভ দেখিয়ে ইমাদউদ্দীনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। আর এই খবিস বাতেনীও তার কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। সে ঠিক এমন সময়ে ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর ওপর গুপ্ত হামলা চালায়, যখন তিনি ঘুমন্ত ছিলেন।

অবশেষে এই নরপিশাচ মহান সুলতান ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীকে শহীদ করে দেয়।

[৩৩]শাহাদাতের সময় এই মহান মুজাহিদের বয়স ছিল ষাট থেকে সত্তরের মাঝে।

এই বেদনাদায়ক সংবাদ মুসলিমবিশ্বের ওপর বজ্রের ন্যায় পতিত হয়। উম্মাহ এক মহান অভিভাবককে হারিয়ে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। চারদিকে মাতম শুরু হয়। মুসলিম উম্মাহ যে পরিমাণ ব্যথা পেয়েছিল সুলতান ইমাদউদ্দীনের শাহাদাতে, ঠিক সেই পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল খ্রিষ্টানরা।

---

৩২. ইতিহাসে তার নাম ইরানকুশ বলা হয়েছে।
৩৩. সালটা ছিল ৫৪১ হিজরী।

প্রসিদ্ধ খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক ম্যাচাড লেখেন, 'ইমাদউদ্দীনের শাহাদাত খ্রিষ্টানদের নব জীবন সঞ্চার করে। তাঁর শাহাদাতে তারা এ পরিমাণ আনন্দ উদযাপন করে যে, অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল—মুসলমানদের তামাম শক্তি ও সামর্থ্য যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।'

ইমাদউদ্দীন চার সন্তান রেখে যান। সাইফউদ্দীন গাজী; যিনি সবার বড় ছিলেন। তারপর নুরউদ্দীন জেঙ্গী, কুতুবউদ্দীন এবং [৩৪]নুসরত উদ্দীন।

কেমন ছিলেন তিনি?

ইমাদউদ্দীন বড় বাহাদুর, সাহসী এবং দৃঢ়প্রত্যয়ী মুজাহিদ ছিলেন। এ দৃঢ়প্রত্যয়ের মাধ্যমেই তিনি বিজয় এবং উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হতে সক্ষম হন।

তার সাহসিকতার অবস্থা তো এমন ছিল যে, তিনি একই সময়ে চারটি রণাঙ্গণে সমানতালে লড়াই করতেও দ্বিধা করেননি।

একদিকে স্বজাতীয় ভাইদের উপর্যুপুরি হামলার জবাব, অন্যদিকে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত আক্রমন প্রতিরোধ করে, পাল্টা আক্রমন করে—একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে আনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

---

৩৪. বা ইজউদ্দীন

ঐতিহাসিকরা লেখেন, 'পরিস্থিতি যতই প্রতিকূলে হোক না কেন, ইমাদউদ্দীন কখনো হতাশ হতেন না। হাল ছেড়ে দিতেন না।'

বস্তুত তার এমন বীরত্ব এবং সাহসিকতাই তাকে সাধারণ থেকে অসাধারণ বানিয়ে দিয়েছে। সামান্য একজন গভর্নর থেকে এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তরকারী হতে পেরেছেন—এ আকাশসমান সাহস আর অদম্য ইচ্ছার কারণেই। যে সালতানাতের বীজ তিনি বুনে গিয়েছেন, পরবর্তীতে তা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষে এক শীসাঢালা প্রাচীর হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী প্রজাবান্ধব একজন সুলতান ছিলেন। দেশের কল্যাণ এবং জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল। প্রতিভার মূল্যায়ন করতে কখনো কুণ্ঠিত হতেন না। সাম্রাজ্যের প্রতিটি সরকারি পদে তিনি এমন যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, যাদের নৈতিক দৃঢ়তা এবং সুষ্ঠু পরিচালনা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। তিনি একটি নদীও খনন করেছিলেন, যা অনেক দূর থেকে আরাফাহর ময়দান পর্যন্ত পানি সরবরাহ করত। তাছাড়া তিনি হাজীদের থাকার জন্য মক্কা মুকাররামা এবং মদীনা মুনাওয়ারায় বহু ভবন নির্মাণ করেছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় প্রিয় নবীজির রওজার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য তিনি পুরো শহরের চারপাশে একটি মজবুত ও দুর্ভেদ্য প্রাচীরও নির্মাণ

করেছিলেন। তিনি প্রতি বছর মক্কা-মদীনায় এই পরিমাণ মুদ্রা এবং খাদ্যশস্য প্রেরণ করতেন, যা সেখানকার দুঃস্থ ও দরিদ্রদের জন্য আগামী কয়েক বছরের খোরাক-পোশাক হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যেত। তাঁর কাছে একটি রেজিস্টার বই থাকত। যাতে ঐ সকল বিধবা, এতিম ও অসহায়দের তালিকা ছিল; যাদের তিনি সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

ইমাদউদ্দীন শহীদ একজন স্বচ্ছ-আকিদার পাকা মুসলমান ছিলেন। শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে বড় কঠোর ছিলেন। তিনি জিহাদের ময়দানেও নামাজ ছাড়তেন না। সালতানাতের সর্বত্র ইসলামি শরীয়াহ কার্যকর ছিল। প্রত্যেক শহরে-নগরে কাজী নিযুক্ত করেছিলেন; যারা কিতাব-সুন্নাহ অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করত। তিনি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে জীবনের মাকসাদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত দীনের জন্য, মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য এবং হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। ঐতিহাসিকরা তাকে সেযুগের সবচেয়ে বড় বীর-বাহাদুর এবং সাহসী ব্যক্তি সাব্যস্ত করেছিলেন।

ইমাদউদ্দীন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য দক্ষতা এবং দূরদর্শিতার আলোকে পরিচালনা করতেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলেন। যারা তাকে সবধরনের খবরাখবর এবং গোপন তথ্য সরবরাহ করত। আমীর ও গভর্নররা তাঁর অনুমতি ব্যতীত কখনো নিজ এলাকা ছেড়ে

কোথাও যেতেন না। প্রায় সময় তিনি উমারা- উমারাদের বলতেন,

'সাম্রাজ্য একটি পুষ্পোদ্যানের মতো। দরদি মালি যতদিন তার পরিচর্যা করতে থাকবে, ততদিন তা সতেজ-শ্যামল থাকবে। কিন্তু যখনই মালি উদাসীন হবে,পরিচর্যা ছেড়ে দিবে; তখনই তা বিরান হয়ে যাবে।'

একবার মসুলে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তিনি দান করে দেন। সেই প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি তাঁর জনগণকে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়তে দেননি। তাঁর পুরো শাসনামলে মসুলের কোথাও কাউকে খাদ্য ও বস্ত্রহীন হতে হয়নি।

ইমাদউদ্দীনের শাহাদাতের পর পুরো সাম্রাজ্য তাঁর বড় দুই ছেলের মাঝে বিভক্ত হয়ে যায়। মসুল ও তার আশপাশের অঞ্চলগুলো বড় ছেলে সাইফউদ্দীন গাজীর অধীনে থাকে। আর অন্যসব অঞ্চল থাকে ছোট ছেলে নূরউদ্দীন জেঙ্গীর শাসনাধীন। সাউফউদ্দীন চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। রেখে যান এক শিশু সন্তান; চাচা নূরউদ্দীন তাকে লালন-পালন করেন। তবে সাইফউদ্দীনের ছেলেও যুবক অবস্থায় মারা যায়। ফলে সাইফউদ্দীনের উত্তরাধিকার আর কেউ থাকলো না। নুরউদ্দীন জেঙ্গী তাঁর অন্য ভাই কুতুবউদ্দীনকে মসুলের গভর্নর বানান। তারপর

তার ছেলেরা মসুল, সাখার এবং জাজিরায় বহুবছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। আর নূরউদ্দীনের অন্য ভাই নুসরতউদ্দীন শাসন পরিচালনায় না এসে নীরবেই জীবন যাপন করেন।

নুরউদ্দীন জেঙ্গীই পিতার যোগ্য অনুসারী এবং উত্তরাধিকার হন। পরবর্তীতে তিনি ক্রুশ এবং ক্রুসেডারদের জন্য পিতা ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী থেকেও বেশি ভয়ংকর প্রমাণিত হন। যতদিন তাঁর বড় ভাই সাইফউদ্দীন জীবিত ছিলেন, ততদিন উভয়ে মিলেই পিতার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। ক্রুসেডারদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। আর সাইফউদ্দীনের ইন্তেকালের পর নুরউদ্দীনের কাঁধেই ন্যাস্ত হয় গোত্রের সকল শাখার নেতৃত্বের দায়িত্ব।

ইতিহাস সাক্ষী, এই মহান বীর, অমর মহানায়ক উম্মাহর সুরক্ষা এবং নিরাপত্তাবিধান উত্তমভাবেই সম্পাদন করেছেন।

- সমাপ্ত -

ইমাদউদ্দীন জেঙ্গী রুহাসহ যেসব অঞ্চল বিজয় করেছেন
আলজুরুম
আলজুরুম
আকরা
বারিফান
কায়সারিয়া
২
রুহা বিজয় মূলত পরবর্তী অঞ্চলসমূহ বিজয়ের ভিত রচনা করে দেয়। কারণ, রুহা শামে ক্রুসেডারদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মজবুত ঘাঁটি ছিল।
নাজদাহ
খুওয়াই
(লিটল) আর্মেনিয়ান কিংডম
দিয়ারে বকর
সালজুক সাম্রাজ্য
তিবরীয
আনতাব
রুহা
যাখু
মারাগ
১
ইমাদউদ্দীন রুহার শাসক জোসলিন দ্বিতীয়র ইউরোপে ভ্রমণে বের হওয়ার সুযোগ নিয়ে রুহা শহরের উপকণ্ঠে সৈন্য সমাবেশ ঘটান।
কামাশলী
আলেপ্পো
হাসাকা
সারায
রাক্কা
সানজার
মসুল
আরবীল
কুর্দিস্তান
হামা
দের আয-যোর
শারকাত
কিরকুক
হোমস
সালজুক সাম্রাজ্য
বোকমাল
ফুরাত
সিরিয়া
সামারা
হাদীসা
বাকুইয়া
দামেশক
রামাদী
আব্বাসী খিলাফত
বাগদাদ
ইরাক
মেহরান
আরবাদ
বিলাদুশ শাম
কারবালা
হিলা
যারকা
নজফ
আল-কুদস
বাইতুল মাকদিস
রুহা অবরোধের ২৮ তম দিনে মজবুত এই দূর্গের একটা অংশ জেঙ্গীবাহিনীর অনবরত হামলায় ভেঙ্গে পড়ে। ফলে সেদিনই দূর্গের পতন ঘটে।
যুদ্ধক্ষেত্র
ইমাদউদ্দীন জেঙ্গীর বিজিত অঞ্চলসমূহ
ক্রুসেড রাজ্যসমূহ
(লিটল) আর্মেনিয়ান কিংডম

ইতিহাস হল দর্পণ। কোন জাতির উত্থান-পতন, যাপিত জীবনপ্রবাহের ধারণা পেতে হলে ইতিহাসের আশ্রয় নিতে হয়। ইতিহাস শুধু জানার জন্য পাঠ করা হয় না; হওয়া উচিৎও নয়। ইতিহাসের পাঠ মূলত ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি নির্ণয় করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইতিহাসের স্বচ্ছ ও নির্মোহ পাঠ আমাদের বর্তমানকে বর্ণময় করতে অনুপ্রাণিত করে। ইতিহাসের নিজস্ব কোন চরিত্র নেই; এটি অতীতের বাঁকে-বাঁকে সংঘটিত জীবনের বিক্ষিপ্ত গল্পের চিত্রায়ন মাত্র। আর তাই ইতিহাসের আলোচিত চরিত্রগুলোই আমাদের ইতিহাসপাঠের মূলে প্রেরণা যোগায়। সময়ের তুমুল আলোচিত ব্যক্তিবর্গের গতর বেয়েই তাই আমরা ইতিহাসের চূড়ায় পৌঁছুই। ইসলামের হাজারবছরের এ পথচলায় তেমনি রয়েছে অগুনিত গল্প ও গল্পকার। যাদের কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে কতোশত ঘটনা। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের সে সব মহান ব্যক্তির যুগান্তকারী কর্ম ও সাধনা উম্মাহর প্রেরণার বাতিঘর হিসেবে আলো বিলিয়েছে। উম্মাহ বার-বার ফিরে গেছে সোনাঝরা সে ইতিহাসের পুনর্পাঠ নিতে। নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিতে, কর্মপদ্ধতি ঠিক করতে ইতিহাসের সে সব বরিত ও মানিত ব্যক্তির জীবন ও কর্মের দ্বারস্থ হতে হয় তাকে। ইতিহাসের সে সব মহীরুহ ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে তাই আমাদের এ আয়োজন— ইতিহাসের স্বর্ণসূত্র।